শরীয়াহর জন্যই আমরা

মাসিক

শরীয়ত

ফেব্রুয়ারী, মার্চ ২০১৫ ইং, প্রস্তুতিমূলক সংখ্যা

نحن للشريعة فداء



শরীয়াহর জন্যই আমরা

মাসিক
শরীয়ত

ফেব্রুয়ারী, মার্চ ২০১৫ ইং

পত্রিকার মূল্য ঃ ৬০ টাকা

যোগাযোগ ঃ
muftihasanimtiaz@yahoo.com
www.shoriotmagazine.wordpress.com
বাংলাবাজার, ঢাকা, বাংলাদেশ।

সূচি

সম্পাদকীয়



ফ্রান্সের পর এবার যুক্ত হলো অস্ট্রেলিয়া

অচিরে তোমাদের বিরুদ্ধে সকল কুফুরী শক্তি একজোট হবে... আল্লাহ তোমাদের শত্রুদের অন্তর থেকে তোমাদের ভয় ও শঙ্কা দূর করে দিবেন আর তোমাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল করে দিবেন জড়তা ও অবসন্নতা। আর এ সবই হবে পার্থিব মোহ ও মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়ার ভয়ে। (মুসনাদে আহমাদ)

সেই সাড়ে চৌদ্দশত বছর পূর্বে কৃত রাসুল সা. এর ভবিষ্যদ্বাণী আজ জলন্ত বাস্তবতায় পরিণত হয়েছে। সময় আসে সময় চলে যায়। নতুন কোন ইস্যু এসে কিছু দিন আলোচনা সমালোচনার ক্ষেত্র তৈরি করে। মিডিয়ায় তাকে কেন্দ্র করে প্রতিবেদন, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, কলাম, ফিচার ইত্যাদি ফলাও করে প্রচার হতে থাকে। অনলাইন যোগাযোগ মাধ্যমে পক্ষে-বিপক্ষে মতামতের ঝড় চলে। কিছু মানুষ এ অঙ্গন ছেড়ে রাস্তায় জড়ো হয়ে প্রতিবাদ করেন। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ নৈতিক দায়িত্ব মনে করে হোক কিংবা মিডিয়ায় কভারেজ পাওয়ার জন্য হোক, সংবাদ মাধ্যমে বিবৃতি দিয়ে দায়িত্ব পার করেন। এমনি করে চলে কিছু দিন। এক পর্যায়ে সবাই নিরব-নিস্তব্ধ হয়ে যান। আন্দোলনকারীরা রাজপথ ছেড়ে আপন কর্মব্যস্ততায় ফিরে যান। সংবাদকর্মীরা সংবাদ সংগ্রহে ব্যস্ত সময় কাটিয়ে কিছুটা বিশ্রামের সুযোগ পান। অপেক্ষায় থাকেন আরেকটি মাঠ গরম করা ইস্যুর। চোখ বন্ধ করেই বলা যায় অনাগত সে ইস্যুটি হয় প্রিয়নবী সা. এর শানে চরম থেকে চরম অবমাননামূলক কোন ব্যঙ্গচিত্র, চলচ্চিত্র, কিংবা কটুক্তি। অথবা কোন মুসলিম দেশে কিংবা মুসলিম জনপদে চরম পৈশাচিক, বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের লোমহর্ষক টাটকা সংবাদ। সংবাদকর্মীগণ আড়মোড়া ভেঙ্গে ছুটে যান সংবাদ সংগ্রহের আশায়। ভাবতে থাকেন কী করে 'আনকমন' একটি শিরোনাম দিয়ে লাইম লাইটে আসা যায়। আন্দোলনকারীগণ খুঁজে পান মাঠে নামার ইস্যু। পাঠক বিরক্ত হচ্ছেন হয় তো। তাই আর এগুলাম না। কিন্তু কী বলবো বড় কষ্ট লাগে আমাদের বারবার একই গর্তে পা মচকানোর দুঃসহ ঘটনা দেখে। আমি কারো আন্দোলন কিংবা প্রতিবাদ-ক্ষোভ প্রকাশকে ছোট করে দেখছি না। তবে নিজেদের এ আন্দোলন সংগ্রামেরব্যর্থতা আর চূড়ান্ত ফলাফলের পথে নিজেদেরই সৃষ্ট ব্যারিকেডগুলো দেখে মন কেন যেন বিষিয়ে ওঠে। এই তো ক'দিন আগের কথা। কুলাঙ্গার লতিফের অবমাননাপূর্ণ উক্তি, এরপর তার ঔদ্ধত্যপূর্ণ একগুয়েমির প্রতিবাদে ধর্মপ্রাণ জনতার আন্দোলন, পরবর্তীতে সরককারের একের পর এক নাটকীয় পদক্ষেপ, অতঃপর জনরোষ থেকে বাঁচার জন্য তার 'কারাগার টু হাসপাতাল' নিবাসের ঘটনা। বিরক্ত-স্তম্ভিত হয়েছে ধর্মপ্রাণ মানুষ। তার যথাযথ শাস্তির কি কোন ব্যবস্থা হয়েছে? বরং সে পরবর্তীতে আরো ধূর্ততা করার মানসিক শক্তি সঞ্চয় করেছে।

এরপরের ঘটনা অবশ্য এদেশে নয়, ঘটেছে ফ্রান্সে। শুরু হয়েছে ব্যঙ্গধর্মী ফরাসী সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন 'শার্লি এবদো'র চরম বিদ্বেষপূর্ণ, কুরুচিপূর্ণ ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশের মধ্য দিয়ে। তার সাথে তাল মিলিয়ে আরেক কুখ্যাত দেশ জার্মানিও সে ব্যঙ্গচিত্র পুনর্মুদ্রণ করেছে। এরপর শ্বেতভল্লুকের দেশ অষ্ট্রেলিয়াও তা ছেপেছে। 'দ্যা উইক অ্যান্ড অষ্ট্রেলিয়া' নামের এ ম্যাগাজিনটি এক নিবন্ধে পশ্চিমা বিশ্বকে *'নৈতিকতা ও বাক স্বাধীনতা'* রক্ষায় কোন ধরণের দুর্বলতা ও আপোষকামিতার মনোভাব না দেখানোর আহ্বান জানিয়েছে। এদিকে গত ৮ জানুয়ারি বুধবার ব্যঙ্গকারী পত্রিকা 'শার্লি এবদো'য় কিছু নবীপ্রেমিক যুবক হামলা চালিয়েছে। খবরে প্রকাশ-*'আল-কায়েদা ইন অ্যারাবিয়ান পেনিনসুলা'* এ সাহসী হামলার দায় স্বীকার করেছে। তারা বিবৃতিতে বলেছে, পরম সত্যপ্রেমী, প্রাণ উৎসর্গী নবীপ্রেমিক ও শাহাদাত পিয়াসী কিছু বীর নওজোয়ান ওদের এবং ওদের দোসরদের দৃষ্টান্তমূলক শিক্ষা দিতে গিয়েছিলো।

এ হামলার পর পশ্চিমাবিশ্ব নড়েচড়ে বসে। ব্যঙ্গকারীদের পক্ষ নিয়ে সম্মিলিত সমাবেশ, বিবৃতি, হুমকি-ধমকি এখনো চলছে। রোববার প্যারিসে 'শার্লি এবদো'য় হামলাকারীদের বিরুদ্ধে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে ১০ লাখ লোক ও ৪০ জনেরও বেশি বিশ্বনেতা যোগ দেন।

বিষয়টি একেবারে স্পষ্ট যে, তারা পরিকল্পিতভাবেই এসব করে যাচ্ছে। বারবার এমন ঘৃণ্য কাজ করে তারা মুসলমানদের ঈমানী শক্তি পরখ করতে চাইছে। তাই সময় এসেছে সোচ্চার হওয়ার। অবিবেচক ও হাস্যকর কোন পদক্ষেপ নয়; চাই বলিষ্ঠ ভূমিকার। খুঁজে বের করা কঠিন নয় - কেন এসব ঘটনার জন্ম দিয়ে তারা অস্থিতিশীল পরিস্থিতি করে চলছে? তাদের সমাবেশের প্রতি চেয়ে দেখুন! এরা হচ্ছে ঐসব বিশ্ব নেতা যারা আফগানিস্তান, ককেশাস, গাজা, লেভান্ত (ভূমধ্যসাগরের পূর্বতীরস্থ দেশগুলো), ইরাক, সোমালিয়া ও ইয়েমেনে চরম রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে?

কখন আমারদের চেতনা ফিরে আসবে? রব্বে মুহাম্মদের শপথ! এটা অস্তিত্বের প্রশ্ন। এ লড়াই ঈমান বনাম কুফরের লড়াই। সময় এসেছে এ হুংকার দেয়ার- তোমরা আমাদের ঈমানী স্ফুলিঙ্গ দেখতে চাও? নবীর প্রতি আমাদের ভালবাসা যাচাই করতে চাও? আমরা আসছি। আমরা মুহাম্মাদের সৈনিক- যারা নবীর জন্য হাসিমুখে জীবন দিতে প্রস্তুত। অভদ্রদের ভদ্রতা কিভাবে শেখাতে হয় তা আমরা ভুলে যাইনি।



দারসুল কুরআন

মানুষ যেভাবে মানুষের রব হয়ে যায়

আল্লাহ তাআলা বলেন,

إتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

অর্থ: "তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের পাদ্রী ধর্মযাজকদেরকে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে এবং মারিয়ামের পুত্র মসীহকেও, অথচ তাদের প্রতি শুধু এই আদেশ করা হয়েছিল যে তারা শুধু এক মা'বুদের ইবাদত করবে যিনি ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই। তিনি তাদের অংশী স্থির করা হতে পবিত্র।" (সূরা তাওবা, আয়াত ৩১)

উপরোক্ত আয়াত থেকে বাহ্যিকভাবে একটি ব্যাপার বুঝে আসে না যে, "তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের পাদ্রী ও ধর্মযাজকদেরকে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে।" অথচ তারা তাদেরকে রব বলে বিশ্বাস বা স্বীকার করতো না বা তাদের ইবাদতও করতো না। বরং তারা আল্লাহকেই রব বলে স্বীকার করতো ও তাঁরই ইবাদত করতো।

হাদীস শরীফে এসেছে ইমাম বুখারী রহ. বর্ণনা করেন,

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي عُنُقِي صَلِيبٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: " يَا عَدِيُّ اطْرَحْ هَذَا الْوَثَنَ مِنْ عُنُقِكَ، فَطَرَحْتُهُ فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقْرَأُ سُورَةَ بَرَاءَةَ فَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ} [التوبة: 31] حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا، فَقُلْتُ: إِنَّا لَسْنَا نَعْبُدُهُمْ، فَقَالَ: «أَلَيْسَ يُحَرِّمُونَ مَا أَحَلَّ اللهُ فَتُحَرِّمُونَهُ، وَيُحِلُّونَ مَا حَرَّمَ اللهُ فَتَسْتَحِلُّونَهُ؟» قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: «فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ

অর্থ: "হযরত আদী ইবনে হাতেম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি গলায় একটি ক্রুশ ঝুলন্ত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এলে তিনি বললেন, হে আদী! এই মূর্তিটি তুমি তোমার গলা থেকে ছুঁড়ে ফেল। ফলে আমি তা খুলে ফেললাম, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকটে এসে দেখতে পেলাম, তিনি সূরা তাওবা তিলাওয়াত করছেন। অতঃপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন, 'তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের পাদ্রী ধর্মযাজকদেরকে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে' আমি বললাম, আমরা তো তাদের ইবাদত করতাম না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আল্লাহ তাআলা যা হালাল করেছেন তারা তা হারাম করতো আর তোমরাও তা হারাম মানতে এবং আল্লাহ তাআলা যা হারাম করেছেন তারা তা হালাল করতো আর তোমরাও তাকে হালাল ভাবতে। আমি বললাম, হ্যাঁ, এমনটি তিনি বললেন, এটিই তাদের ইবাদত। (তারিখুল কাবীর লিল ইমাম বুখারী ৭ম খন্ড ৪৭১ নং হাদীস, সুনানে তিরমিযী: ৩০৯৫, মু'জামুল কাবীর লিত তাবারানী: *১৭/৯২/২১৮,২১৯ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী: ২০৩৫০)*

পাদ্রী ও ধর্মযাজকেরা আল্লাহ কর্তৃক হালালকে হারাম আর হারামকে হালাল করতো। যার ফলশ্রুতিতে তারা রবের স্থানে সমাসীন হয়েছে। আর যারা এক্ষেত্রে তাদের আনুগত্য করেছে তারা বাস্তবে তাদেরকেই রব হিসেবে মেনে নিয়েছে। তারা যদিও আল্লাহ তাআলারই ইবাদত করতো কিন্তু জীবনের নানা ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধানকে বাদ দিয়ে পাদ্রী সন্ন্যাসীদের বিধান গ্রহণ করেছিল। তাই আল্লাহ তাআলা বলেছেন, তারা আল্লাহ ব্যতিরেকে তাদের পাদ্রী ও ধর্মযাজকদেরকে তাদের রবরূপে গ্রহণ করেছে।

উম্মতের মুফাস্‌সিরগণ এই একই ব্যাখ্যা দিয়েছেন

হুযায়ফা রাযি. এর ব্যাখ্যা:

عن أبي البختري قال: قيل لحذيفة أرأيت قول الله اتخذوا أحبارهم؟ قال: أما إنهم لم يكونوا يصومون لهم ولا يصلون لهم، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئاً استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئاً أحله الله لهم حرموه، فتلك كانت ربوبيتهم

আবুল বুখতারী রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুযায়ফা রাযি. কে বলা হলো, আল্লাহর বাণী اتخذوا أحبارهم সম্পর্কে আপনার মতামত কী? তিনি বললেন, তারা তো পাদ্রী ও ধর্মযাজকদের উদ্দেশ্যে নামায রোজা করতো না। পক্ষান্তরে তাদের অবস্থা ছিল, যখন পাদ্রীরা তাদের জন্য কোন কিছুকে হালাল করতো তারাও তাকে হালাল মনে করতো। আল্লাহ তাআলা কর্তৃক কোন হালালকে যদি পাদ্রীরা হারাম করতো তারাও তা হারাম ভাবত, এটাই ছিল তাদেরকে রব হিসেবে মেনে নেয়া। *(তাফসীরুত ত্বাবারী, হাদীস নং ১৬৬৩৬)*

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. এর ব্যাখ্যা:

﴿اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ﴾ قال عبد الله بن عباس: لم يأمروهم أن يسجدوا لهم، ولكن أمروهم بمعصية الله فأطاعوهم، فسماهم الله بذلك أرباباً"﴾

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, পাদ্রীরা তাদেরকে নিজেদের সিজদাহ করতে আদেশ করতো না বরং তাদেরকে আল্লাহর অবাধ্যতার আদেশ দিত, আর তারা তাদের অনুসরণ করতো। এ কারণেই আল্লাহ তাদেরকে রব হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। *(তাফসীরুত ত্বাবারী, হাদীস নং ১৬৬৪১)*

ইমাম তবারী রহ.﴿ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ ﴾ এর ব্যাখ্যায় বলেন,

يعني سادة لهم من دون الله، يطيعونهم في معاصي الله، فيحلون ما أحلوه لهم مما قد حرمه الله عليهم، ويحرمون ما يحرمونه عليهم، مما قد أحله الله لهم.

অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতিরেকে তাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে আল্লাহর অবাধ্যতায় আনুগত্য করে। আল্লাহ কর্তৃক হারামকৃত যে বিষয়কে তারা হালাল করেছে এরা তাকে হালাল ভাবে, আল্লাহ কর্তৃক হালালকৃত যে বিষয়কে তারা হারাম করেছে এরাও তাকে হারাম মনে করে। (তাফসীরুত তবারী, খন্ড, ১৪, পৃষ্ঠা ২১৯)

আমাদের মাযহাবের প্রসিদ্ধ মুফাস্সির ইমাম জাস্সাস রহ. বলেন,

وإنما وصفهم الله تعالى بأنهم اتخذوهم أرباباً، لأنهم أنزلوهم منزلة ربهم وخالقهم في قبول تحريمهم وتحليلهم، لما لم يحرمه الله، ولم يحلله، ولا يستحق أحد أن يطاع بمثله إلا الله تعالى، الذي هو خالقهم. والمكلفون كلهم متساوون في لزوم عبادة الله واتباع أمره وتوجيه العبادة إليه دون غيره

আল্লাহ তাআলা এদেরকে এই বিশেষণে অবহিত করেছেন যে, এরা পাদ্রী ও ধর্মযাজকদেরকে রব হিসাবে গ্রহণ করেছে। কেননা তারা তাদেরকে তাদের রব ও সৃষ্টিকর্তার আসনে সমাসীন করিয়েছে। তারা তাদের থেকে এমন হালাল-হারাম গ্রহণ করেছে যাকে আল্লাহ তাআলা হালাল-হারাম করেননি। এ ধরনের আনুগত্যের অধিকারী একমাত্র সেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যিনি তাদের সৃষ্টিকর্তা। আর বান্দারা তাঁর ইবাদত ও আদেশ পালন করার ক্ষেত্রে এবং ইবাদতকে শুধু তাঁরই জন্য নির্দিষ্ট করার ক্ষেত্রে সকলেই সমান । *(আহকামুল কুরআন, খন্ড ২, পৃষ্ঠা ২৯৭)*

আল্লামা শানক্বিতী রহ. বলেন,

وَقَوْلِهِ : اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ [9 \ 31] ، فَإِنَّ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا قَالَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : كَيْفَ اتَّخَذُوهُمْ أَرْبَابًا ؟ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «إِنَّهُمْ أَحَلُّوا لَهُمْ مَا حَرَّمَ اللَّهُ ، وَحَرَّمُوا عَلَيْهِمْ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فَاتَّبَعُوهُمْ» ، وَذَلِكَ هُوَ مَعْنَى اتِّخَاذِهِمْ إِيَّاهُمْ أَرْبَابًا . وَيُفْهَمُ مِنْ هَذِهِ الْآيَاتِ بِوُضُوحٍ لَا لَبْسَ فِيهِ أَنَّ مَنِ اتَّبَعَ تَشْرِيعَ الشَّيْطَانِ مُؤْثِرًا لَهُ عَلَى مَا جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ ، فَهُوَ كَافِرٌ بِاللَّهِ ، عَابِدٌ لِلشَّيْطَانِ ، مُتَّخِذُ الشَّيْطَانَ رَبًّا ، وَإِنْ سَمَّى اتِّبَاعَهُ لِلشَّيْطَانِ بِمَا شَاءَ مِنَ الْأَسْمَاءِ ;

আল্লাহ তাআলার বাণী, ‘তারা আল্লাহকে ব্যতিরেকে তাদের পাদ্রীও ধর্মযাজকদেরকে রবরূপে গ্রহণ করেছে’ আদী বিন হাতিম রাযি. যখন নবী সালালাহু আলাইহি ওয়া সালামকে জিজ্ঞাসা করলেন, কিভাবে তারা তাদেরকে রব হিসাবে গ্রহণ করেছে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, আল্লাহ তাআলা যা হারাম করেছিলেন তারা এদের জন্য তা বৈধ করেছে। আর আল্লাহ তাআলা যা হালাল করেছিলেন তারা এদের জন্য তা হারাম করেছে। আর এরা তাদের অনুসরণ করেছে।” আর তাদেরকে রব হিসাবে গ্রহণ করার অর্থ এটাই। এ আয়াতগুলো থেকে স্পষ্টভাবে কোন ধরনের সংশয় ব্যতীত বুঝে আসে, যে ব্যক্তি রাসূলদের আনিত বিধানের ওপর শয়তানের বিধানকে অগ্রাধিকার দিয়ে তার অনুসরণ করবে, সে আল্লাহ তাআলাকে অস্বীকারকারী, শয়তানের ইবাদাতকারী, শয়তানকেই রব হিসাবে গ্রহণকারী। তার এ অনুসরণকে সে যে নামেই অভিহিত করুক না কেন। কেননা শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে বাস্তবতাকে পরিবর্তন করা যায় না। যা স্পষ্ট বিষয়। *(তাফসীরে আদ-ওয়াউল বয়ান, খন্ড ১, পৃষ্ঠা ৩০৭)*

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মাণ হলো, ইহুদী-খ্রিষ্টানরা তাদের ধর্মগুরুদের সামনে রুকু বা সিজদা করতো না। তারা যা করতো ধর্মগুরুরা যা বৈধ করতো, তাকে তারাও বৈধ হিসাবে মেনে নিতো। তারা যা অবৈধ ঘোষণা করতো তাকে তারাও অবৈধ হিসাবে মেনে নিতো। আর উক্ত কাজটির পরিপেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা দিয়েছেন, তোমরা তাদেরকেই মূলত রব হিসাবে মেনে নিয়েছো। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটিকেই তাদের ইবাদত বলে আখ্যায়িত করেছেন।

বি. দ্র. ঃ যারা রাষ্ট্রীয়ভাবে আল্লাহ প্রদত্ত হালালগুলোকে অবৈধ করছে, হারামগুলোকে বৈধ করছে শুধু এখানেই ক্ষান্ত নয়, বরং আল্লাহর বান্দাদেরকে তা মানতে বাধ্য করছে, না মানলে শাস্তি প্রদান করছে, তারাও নিজেদেরকে মিথ্যা রবের স্থানে বসিয়েছে। আল্লাহ তাআলার রুবূবিয়্যাতের ক্ষেত্রে নিজেদেরকে শরীক করছে। কেননা উপরোক্ত ক্ষমতা শুধু একমাত্র আল্লাহ তাআলারই কর্তৃত্বে। সুতরাং তারা মুমিন ও মুসলিম নয়, হতে পারে না; বরং তারা অবিশ্বাসী ও কাফের।

গণতন্ত্র

দারসুল হাদিস

ফেতনার যুগে করণীয় সম্পর্কে প্রিয়নবী সা. এর ভবিষ্যদ্বাণী

রাসূল সা. এর ভবিষ্যদ্বাণীর আলোকে বর্তমান সময়টা যে ফেতনার যুগ তা বোধ হয় উপলব্ধি করতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। হাদীসের ভাষায় তাসবী-র বাঁধন খুলে দিলে যেমনি একের পর এক দানা ছিটকে পড়তে থাকে তেমনি করে শেষ যামানায় ফেতনা ছড়াবে। প্রিয় রাসূল সা. সে সময়ের কথা চিন্তা করে কখনো নির্বাক হয়ে ধ্যানমগ্ন হয়ে পড়তেন। কখনো আকস্মিকভাবে সাহাবাদের একত্রিত করে অনাগত ভবিষ্যত সম্পর্কে অবগত করতেন। সাথে সাথে করণীয় বাতলে দিতেন। কখনো হঠাৎ ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে সে সম্পর্কে গায়েবী ইশারালব্ধ করণীয় দিক-নির্দেশনা বলতে থাকতেন। যাদের সামনে এসব বিষয়গুলো ঘটতো, যারা ঐ সময় নিজ চোখে রাসূল সা. এর পবিত্র যবান থেকে তা শুনতেন তাঁরা রাসূল সা. এর বাচনভঙ্গি আর বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করে আবেগতাড়িত হয়ে পড়তেন। কখনো ভয়ে কাঁদতে থাকতেন। পরক্ষণেই করণীয় জানতে পেরে এতটাই উদ্বেলিত হতেন যে, একজন নারীও সে ভবিষ্যদ্বাণীর উত্তম দলের সদস্য হতে মরিয়া হয়ে রাসূলের কাছে সে জন্য দুআ চাইতেন। পথের দূরত্বের তোয়াক্কা না করে সে দলে জান-মাল সর্বস্ব ব্যয়ের জন্য উন্মুখ হয়ে থাকতেন। অন্যদিকে বিষয়ের স্পর্শকাতরতা উপলব্ধি করতে পেরে ওমর রাযি. এর মত ব্যক্তিত্বও ঘাবড়ে যেতেন। রাসূল সা. জানতেন এসব ঘটনার অধিকাংশই আরো পরে পর্যায়ক্রমে ঘটবে। তাই সাহাবাদের আগ্রহ-উদ্দীপনা, ভয়-উদ্বিগ্নতা দেখে সান্তনা দিতেন। এমনই ছিল রাসূলের সাহাবীরা; রাসূলের কথা যারা মনপ্রাণ এক করে আত্মস্থ করতেন। অতঃপর তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোন রক্তচক্ষুকে ভয় করতেন না। তবে যাদের জন্য এসব ভবিষ্যদ্বাণী বলে গেলেন, যারা এর প্রকৃত হকদার, সে আমরা কি আজ মিলিয়ে দেখছি ফিতনা সম্পর্কিত রাসূলের ভবিষ্যদ্বাণীগুলো। নিজেদের কর্মপন্থা কি ঠিক করে নিচ্ছি; কিংবা যাচাই করে দেখছি নিজেদের অবস্থান কোথায়? যদি মনে করি রাসূলের ভবিষ্যদ্বাণীর সে যুগ এখনো 'দূর কি বাত' তাহলে বলতে হয়, আমরা রাসূলের সাহাবীদের চেয়ে দীন বেশি বুঝে গেছি। আর না হয় ফেতনার সয়লাবে অজান্তেই ধীরে ধীরে ভেসে যাচ্ছি।

আসুন ফেতনার যুগে করণীয় সম্পর্কে রাসূল সা. কী বলেছেন তা একটু দেখে নিই।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " خَيْرُ النَّاسِ فِي الْفِتَنِ رَجُلٌ آخِذٌ بِعِنَانِ فَرَسِهِ - أَوْ قَالَ: بِرَسَنِ فَرَسِهِ - خَلْفَ أَعْدَاءِ اللَّهِ يُخِيفُهُمْ وَيُخِيفُونَهُ، أَوْ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِي بَادِيَتِهِ يُؤَدِّي حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى الَّذِي عَلَيْهِ

১. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন, ফেতনার যুগে সর্বোত্তম মানুষ সে ব্যক্তি, যে নিজ ঘোড়ার লাগাম অথবা নাকের রশি ধরে আল্লাহর শত্রুকে ধাওয়া করবে। সে আল্লাহর শত্রুদের সন্ত্রস্ত করে তুলবে, তারাও তাকে ভীতি প্রদর্শন করবে। কিংবা সে ব্যক্তি উত্তম যে লোকালয় শুন্য এলাকায় যাযাবরের মত নিভৃত জীবনযাপন করবে এবং আল্লাহর বিধানাবলী পালন করবে। (মুস্তাদরাকে হাকেম, ৪/৫১০)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا، ثُمَّ يَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ» قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَنِ الْغُرَبَاءُ؟ قَالَ: «الَّذِينَ يُصْلِحُونَ إِذَا فَسَدَ النَّاسُ،

২. হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সা. বলেছেন, ইসলাম অপরিচিত অবস্থায় আত্মপ্রকাশ করেছে, অচিরেই তা আবার অপরিচিত হয়ে যাবে। সুতরাং গুরাবাদের মোবারকবাদ! সাহাবী জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি. জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! গুরাবা কারা? তিনি বললেন, ঐসব লোক যারা মানুষ যখন বিগড়ে যাবে তখন তাদের সংশোধনের দায়িত্ব আঞ্জাম দিবে। (আল মু'জামুল আওসাত, ৫/১৪৯)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَحَبُّ شَيْءٍ إِلَى اللهِ تَعَالَى الْغُرَبَاءُ» ، قِيلَ: وَمَنِ الْغُرَبَاءُ؟ قَالَ: «الْفَرَّارُونَ بِدِينِهِمْ ، يَبْعَثُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ»

অন্য এক হাদীসে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি. হতে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেন, আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় হলো গুরাবাগণ। জিজ্ঞেস করা হলো, গুরাবা কারা? তিনি বললেন, নিজ দীন-ঈমান নিয়ে পলায়নকারীরা। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদেরকে ঈসা আ. এর সাথে পুনরুত্থান করবেন। (হিলয়াতুল আউলিয়া, ১/২৫)

হযরত ঈসা আ. এর সাথে যাদের পুনরুত্থান হবে, তারা কারা? এ বিষয়ে আরো স্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায় অন্যান্য হাদীসে। যেমন, সুনানে আবূ দাউদের এক হাদীসে এসেছে,

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمْ، حَتَّى يُقَاتِلَ آخِرُهُمُ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ»

হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন রাযি. বর্ণনা করেন, রাসূল সা. বলেন, আমার উম্মতের একটি দল হক্বের পথে অবিচলভাবে জিহাদ ও কিতাল করে যাবে। তারা তাদের বিরোধীদের ওপর সর্বদা বিজয়ী থাকবে। এ দলটির সর্বশেষ অংশ ঈসা আ. এর সাথে মিলে দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। (আবূ দাউদ)

অন্য এক হাদীসে এ দলটিকে 'ত্বায়েফায়ে মানসূরা' তথা সাহায্যপ্রাপ্ত দল বলা হয়েছে। -ইবনে মাজা তো উপরিউক্ত হাদীসসমূহ থেকে বুঝা যায় ফিতনার সময় এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বিকল্প নেই। আর এ শ্রেণীটি পৃথিবীর কোন কোন ফ্রন্টে থাকবে এ সম্পর্কে হাদীসে বিশদ বর্ণনা এসেছে। আসুন দেখে নেয়া যাক হাদীসগুলো।

খোরাসান:

এ অঞ্চল সম্পর্কে অনেক সহীহ হাদীস এসেছে। ইমাম মাহদীর সৈন্যবাহিনী এখানেই সুসংগঠিত হবে।

عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّايَاتِ السُّودَ خَرَجَتْ مِنْ قِبَلِ خُرَاسَانَ فَأْتُوهَا وَلَوْ حَبْوًا، فَإِنَّ فِيهَا خَلِيفَةَ اللَّهِ الْمَهْدِيَّ»

হযরত ছাওবান রাযি. বর্ণনা করেন, রাসূল সা. এরশাদ করেছেন, যখন তোমরা খোরাসানের দিক থেকে কালো পতাকাবাহীদের আসতে দেখবে তখন তাদের সাথে যোগ দিবে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও। (অর্থাৎ, বিপদসংকুল পিচ্ছিল পথ পারি দিয়ে হলেও।) কারণ, এদের মাঝেই রয়েছে আল্লাহর খলিফা মাহদী আ.। (মুস্তাদরাকে হাকিম, ৪/৫৪৭)

আরেক হাদীসে আছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَخْرُجُ مِنْ خُرَاسَانَ رَايَاتٌ سُودٌ لَا يَرُدُّهَا شَيْءٌ حَتَّى تُنْصَبَ بِإِيلِيَاءَ»

হযরত আবূ হুরায়রা রাযি. বর্ণনা করেন, রাসূল সা. বলেছেন, খোরাসান থেকে কালো পতাকাবাহীরা বের হবে; কেউ তাদের দমাতে পারবেনা। পরিশেষে তারা বাইতুল মুকাদ্দাসে গিয়ে কালেমার ঝাণ্ডা উড্ডীন করবে। (তিরমিযী) উল্লেখ্য যে, হাদীসে বর্ণিত খোরাসান বলতে বর্তমানের আফগানিস্তান, পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী কিছু এলাকা, উজবেকিস্তানের কিছু অঞ্চল এবং ইরানের একটা অংশ বোঝানো হয়েছে। তবে এর হৃদপিণ্ড হচ্ছে আফগানিস্তান। যেটি প্রসিদ্ধ গবেষক ড. ইসরার রহমান তার গবেষণায় উল্লেখ করেছেন।

ইরাক, শাম, ইয়ামেন : এ তিন অঞ্চল সম্পর্কে এক হাদীসে মৌলিক ভবিষ্যদ্বাণী বিবৃত হয়েছে।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوَالَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سَتُجَنَّدُونَ أَجْنَادًا جُنْدًا بِالشَّامِ ، وَجُنْدًا بِالْعِرَاقِ ، وَجُنْدًا بِالْيَمَنِ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، اخْتَرْ لِي ، قَالَ عَلَيْكُمْ بِالشَّامِ ، فَمَنْ أَبَى ، فَلْيَلْحَقْ بِيَمَنِهِ ، وَلْيَسْقِ مِنْ غُدُرِهِ ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ تَكَفَّلَ لِي بِالشَّامِ وَأَهْلِهِ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হাওয়ালা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সা. এরশাদ করেন, অচিরেই তিনটি বাহিনী বের হবে; একটি শামে, একটি ইরাকে, অপরটি ইয়েমেনে। বর্ণনাকারী সাহাবী বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কোনটাতে যোগ দিব? বলে দিন। তিনি বললেন, তোমরা শামকে বেছে নিবে। যে তা না পারবে সে যেন ইয়েমেনের বাহিনীর সাথে যুক্ত হয়ে যায় এবং তার কূপগুলো থেকে পানি পান করে। কারণ, আল্লাহ তাআলা আমার জন্য শামের দায়িত্ব নিয়েছেন। (মুস্তাদরাকে হাকেম)

এ ছাড়া শাম ও ইয়ামেন সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন হাদীসও বর্ণিত হয়েছে।

শাম

عن أَبَا الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «يَوْمَ الْمَلْحَمَةِ الْكُبْرَى فُسْطَاطُ الْمُسْلِمِينَ، بِأَرْضٍ يُقَالُ لَهَا الْغُوطَةُ، فِيهَا مَدِينَةٌ يُقَالُ لَهَا دِمَشْقُ، خَيْرُ مَنَازِلِ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَئِذٍ

হযরত আবূ দারদা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেন, মহাযুদ্ধের সময় মুসলমানদের তাঁবু (যুদ্ধ ছাউনি) হবে 'গুতাহ' নামক স্থানে। যেটি দামেশক শহরের পাশে অবস্থিত। এটি শামের উত্তম শহরগুলোর একটি। (মুস্তাদরাকে হাকেম)

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَ مُعَاوِيَةَ وَالنَّاسَ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ إِذَا وَقَعَتِ الْمَلاحِمُ بَعَثَ اللَّهُ مِنْ دِمَشْقَ بَعْثًا مِنَ الْمَوَالِي هُمْ أَكْرَمُ الْعَرَبِ فَرَسًا ، وَأَجْوَدُهُ سِلاحًا يُؤَيِّدُ اللَّهُ بِهِمُ الدِّينَ (تاريخ دمشق لابن عساكر)

হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে আরেক বর্ণনায় শামের এ দলটির ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে, এরা সে সময়ে আরবের সেরা অশ্বারোহী হবে এবং অত্যাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত থাকবে। আল্লাহ এদের মাধ্যমে দীনকে শক্তিশালী করবেন। (তারীখে দিমাশক)

ইয়েমেন

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ مِنْ عَدَنِ أَبْيَنَ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا يَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، هُمْ خَيْرُ مَنْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ (مسند أحمد بن حنبل)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেন,'আদ্‌নে আবইয়ান' (ইয়ামেনের একটি অঞ্চল) থেকে বার হাজার যোদ্ধা বের হবে। তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাহায্য করবে। আমার ও তাঁদের মধ্যবর্তী সবার চেয়ে তারা সর্বোত্তম লোক। (মুসনাদে আহমাদ)

হিন্দুস্তান

এ অঞ্চল সম্পর্কে একাধিক সহীহ হাদীস রয়েছে।

عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (عِصَابَتَانِ مِنْ أُمَّتِي أَحْرَزَهُمَا اللَّهُ مِنَ النَّارِ : عِصَابَةٌ تَغْزُو الْهِنْدَ ، وَعِصَابَةٌ تَكُونُ مَعَ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلَام) العصابة : الجماعة . أحرزهما : وقاهما (رواه النسائي رقم317, والإمام أحمد في المسند)

১. হযরত ছাওবান রাযি. যিনি রাসূল সা. এর আযাদকৃত গোলাম ছিলেন থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেন, আমার উম্মতের দুইটি দলকে আল্লাহ তাআলা জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবেন। তার একটি হল হিন্দুস্তানে যুদ্ধরত বাহিনী। অপরটি হল ঈসা আ. এর যোদ্ধাদল। (নাসায়ী, মুসনাদে আহমাদ)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : (وَعَدَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ الْهِنْدِ ، فَإِنِ اسْتُشْهِدْتُ كُنْتُ مِنْ خَيْرِ الشُّهَدَاءِ ، وَإِنْ رَجَعْتُ فَأَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْمُحَرَّرُ (رواه الإمام أحمد في المسند)

হযরত আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সা. আমাদেরকে হিন্দুস্তানের অভিযানের ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বানী করেছেন এবং বলেছেন, যদি আমি (আবূ হুরায়রা) সে যুদ্ধে শহীদ হই তাহলে আমি হবো সর্বোত্তম শহীদ। আর যদি গাজী হয়ে ফিরি, তাহলে আমি জাহান্নাম থেকে মুক্ত স্বাধীন আবূ হুরায়রা। (মুসনাদে আহমাদ)

আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে আরেক হাদীসে আরো স্পষ্ট ও নির্দিষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - وذكر الهند - فقال : (ليغزون الهند لكم جيش يفتح الله عليهم ، حتى يأتوا بملوكهم مغللين بالسلاسل ، يغفر الله ذنوبهم ، فينصرفون حين ينصرفون فيجدون ابن مريم بالشام) قال أبو هريرة : إن أنا أدركت تلك الغزوة بعت كل طارف لي وتالد وغزوتها ، فإذا فتح الله علينا وانصرفنا فأنا أبو هريرة المحرر ، يقدم الشام فيجد فيها عيسى بن مريم ، فلأحرصن أن أدنوا منه فأخبره أني قد صحبتك يا رسول الله . قال : فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحك ثم قال : هيهات ، هيهات)رواه نعيم بن حماد في " الفتن)

তিনি বলেন, রাসূল সা. হিন্দুস্তান প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, অবশ্যই হিন্দুস্তানে যুদ্ধ হবে; সে যুদ্ধে তোমাদের এমন এক বাহিনী লড়বে- আল্লাহ যাদের গলায় বিজয়মাল্য পরাবেন। এমনকি তারা হিন্দুস্তানের শাসকদের শেকলে বেঁধে নিয়ে আসবে। আল্লাহ এ দলটির গুনাহ মাফ করে দিবেন। তারা যখন যুদ্ধ শেষে ফিরবে, তখন ঈসা আ. কে তাঁরা শামে এসে পেয়ে যাবে। আবূ হুরায়রা রযি. বলেন, যদি আমি এ যুদ্ধে অংশ গ্রহণের সুযোগ পেয়ে যাই, তাহলে আমি আমার নতুন-পুরাতন সকল সম্পদ ব্যয় করে সে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করবো। অতঃপর যখন আল্লাহ আমাদের বিজয় দান করবেন, আর আমরা ফিরে আসবো; তখন আমি হব– মুক্ত- স্বাধীন আবূ হুরায়রা। এ বাহিনীটি শামের দিকে মার্চ করবে। সেখানে তারা ঈসা আ. এর সাথে মিলিত হবে। আমার খুব ইচ্ছা তাঁর সাক্ষাৎ পাওয়ার। পেলে বলবো – আমি রাসূল সা. এর সাহাবী। একথা শুনে রাসূল সা. হাসতে হাসতে বললেন 'এত তাড়াতাড়ি নয়; আরো পরে আরো পরে..।' (আল-ফিতান)





রাসূল (সাঃ) এর অবমাননাকারীদের সাথে কথা হবে তরবারী দিয়ে

-আল্লামা আনোয়ার শাহ্ কাশ্মিরী রহ.

এখানে আমরা আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. এর 'আস্-সারিমুল মাসলুল' নামক কিতাব থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষ কিছু উদ্ধৃতি পেশ করবো।

নবীদের দোষ অন্বেষণ, কিংবা তাদের হেয় প্রতিপন্ন করা নিঃসন্দেহে কুফুরী কাজ; বরং বলা উচিত সবচে বড় কুফুরী কাজ। আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. এ মাসআলাটি বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করেছেন। তাঁর কিতাবটি কুরআন-সুন্নাহ, ইজমা-কিয়াস থেকে আহরিত অকাট্য দলীলাদি দ্বারা সমৃদ্ধ। তিনি এ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, রাসূল সাঃ এর জন্য তো বিষয়টি তাঁর ইচ্ছাধিন ছিল- চাইলে তিনি তাকে মাফ করতে পারতেন, চাইলে হত্যা করতে পারতেন। উভয় বিধানই তাঁর জীবদ্দশায় কার্যকর হয়েছিল। তবে তাঁর উম্মতের দায়িত্ব হল, এমন কুলাঙ্গারকে হত্যা করে দেয়া। এখন রইল এ বিষয় যে, তাকে তওবা করতে বলা হবে কিনা এবং করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে কিনা। এক্ষেত্রে ফুক্বাহাদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। তবে তার কাফের হওয়ার বিষয়ে সবাই একমত।

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. ব্যঙ্গকারীর কুফুরী প্রমাণ করতে গিয়ে সাহাবীদের মতামত ও সিদ্ধান্তগুলোও উল্লেখ করেছেন। যেগুলো স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, প্রাণ সংহারই তার একমাত্র শাস্তি। তাদের মতামতগুলো এক্ষেত্রে অকাট্য প্রমাণস্বরূপ।

এক. হযরত আবু বকররাযি. এক মহিলার ব্যাপারে নির্দেশ জারি করেছিলেন,যে কিনা রাসূল সা. এর শানে কটুক্তি করেছিল, যদি তোমরা এর ব্যাপারে পূর্বেই সিদ্ধান্ত না নিয়েফেলতে, তাহলে আমি তোমাদের আদেশ দিতাম একে হত্যাকরার। কারণ,নবী-রাসূলদের শানে বেয়াদবি করা অন্য সব অপরাধের মত নয়। যে মুসলমান এ অপরাধে লিপ্ত হবে সে মুরতাদ হয়ে যাবে। আর যদি অমুসলিম (যিম্মী) এ অপরাধে লিপ্ত হয়, তাহলে তার অঙ্গীকারচুক্তি বাতিল হয়ে যাবে এবং তার রক্ত হালাল হয়ে যাবে।

দুই. একবার হযরত উমর রাযি. এর দরবারে এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হল, যে রাসূল সা. এর শানে কটু কথা বলেছিল। তখন তিনি তাকে প্রাণদণ্ড দিলেন। অতঃপর ফরমান জারি করলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর শানে অথবা কোন নবীর শানে বেয়াদবীমূলক কথা বলবে, তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে। **'তিন.** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. এমন ব্যক্তি সম্পর্কে বলেন, এটা প্রকারান্তরে রাসূল সা. কেই মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়। কেউ এমন করলে মুরতাদ বলে বিবেচিত হবে। প্রথমত তাকে তওবা করতে বলা হবে। যদি তওবা করে তাহলে তো বেঁচে গেল, অন্যথায় তাকে হত্যা করে ফেলতে হবে। আর যদি কোন অমুসলিম যে জিযিয়া কর দিয়ে ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাস করে- আল্লাহর শানে কিংবা কোন নবীর শানে অবজ্ঞাপূর্ণ মন্তব্য করে, তাহলে তার 'নিরাপত্তাচুক্তি' বাতিল হয়ে যাবে এবং এ অপরাধের শাস্তিস্বরূপ তাকে হত্যা করা হবে।

কোন নবীর শানে অন্যদের বিদ্রুপাত্মক কথা বা বাজে মন্তব্য রটিয়ে বেড়ানোর বিধান

কখনো ব্যঙ্গকারী ব্যক্তি নিজে বাঁচার জন্য জোচ্চরির আশ্রয় অবলম্বন করে থাকে। নিজে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করার পরিবর্তে অন্যদের ব্যঙ্গাত্মক কথা বর্ণনা করে থাকে। এটা স্রেফ ধোঁকা। কারণ, এটা তার আত্মরক্ষা কৌশল বৈ অন্য কিছু নয়। কেননা এভাবে সে জঘন্য পাপকর্মের খাহেশ মিটিয়ে প্রচার করে নেয়। প্রকৃত অর্থে এটা তার ভিতরকার কুফুরীকেই প্রকাশ করে যা, অসতর্কতার নামে তার লেখালেখিতে কিংবা কথা কাজে ফুঁটে ওঠে।

শায়খুল ইসলাম আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. লিখেন, আমাদের মাশায়েখগণ বলেছেন, আল্লাহ তাআলার শানে কিংবা রাসূলুল্লাহ সা. এর শানে ইশারা-ঈঙ্গিতেও বিদ্রুপাত্মক কিছু বলা কুফুরী কাজ। এর শাস্তিও মৃত্যুদণ্ড। এমনিভাবে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. থেকেও অনুরূপ ফতোয়া বর্ণিত আছে। আল্লামা খাফ্ফাজি রহ. 'নাসিমুর রিয়াদ' নামক গ্রন্থে লিখেন, রাসূল সা. এর শানে ব্যঙ্গাত্মক কথা অন্যের নামে প্রচারকারী সম্পর্কে যদি এটা প্রমাণ হয় যে, **এক.** এসব গালাগাল মূলত তার রচিত। গা বাঁচানোর জন্যই সে অন্যের নামে প্রচার করেছে। **দুই.** অথবা তার অভ্যাসই হচ্ছে এসব কুরুচিপূর্ণ কথা নিজে বলে অন্যের নামে চালিয়ে দেয়া। **তিন.** অথবা নিজে বানায়নি ঠিক; তবে বেয়াদবিপূর্ণ এসব বাজে কথা প্রচার করা সে কোন দোষণীয় কাজ মনে করে না; বরং রসিয়ে রসিয়ে প্রচার করে। **চার.** অথবা এ ধরণের অবজ্ঞাপূর্ণ দুরাচারকে সে সমর্থন করে এবং এটাকে মামুলি বিষয় মনে করে। **পাঁচ.** কিংবা এসবই তার ধ্যানমান এতেই সে আনন্দ পায়। **ছয়.** অথবা সে এসব নোংরা বিষয়েরই তালাশে থাকে। রাসূল সা. এর শানে ব্যঙ্গাত্মক গল্প, কবিতা (কার্টুন) প্রচার করাই তার কাজ। উল্লিখিত সকল ক্ষেত্রে বর্ণনাকারী আর রচয়িতার হুকুম এক। এদেরকে অনতিবিলম্বে হত্যা করে জাহান্নামের রাস্তা তরান্বিত করতে হবে। **-ইকফারুল মুলহিদীন থেকে সংগৃহীত**

ইসলাম ও কুফরের মাঝে লড়াইয়ের সময়ে নিরপেক্ষ থাকা

মুনাফিকের আলামত

-সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ রহ.

আল্লাহর বান্দা, দোজাহানের সর্দার হযরত মুহাম্মদ সা. এর আনিত দ্বীনের খাদেম, মুসলমানদের হিতাকাঙ্খী, আমীরুল মু'মিনীন নামে পরিচিত এই অধম আরয করছি- যা সমস্ত মুসলমানদের জন্য চাই সে বড় আলেম হোক বা সাধারণ জনতা হোক, ধনী হোক বা গরীব সবার জন্য প্রযোজ্য। সম্মানিত ভাই সকল! এই মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য এটাই নির্ধারণ করে রেখেছেন যে, সে তার প্রভূর ইবাদত করবে এবং আরব সর্দার রসূল সা. এর সাচ্চা অনুসারী হয়ে যাবে। খেলাধূলা এবং রং তামাশায় মত্ত থাকার উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেননি। আসল যোগ্যতা হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন; সম্মান ও ক্ষমতা অর্জন নয়। নয় যশ-খ্যাতির পিছনে কাঙ্গালের মত ছুটে চলা। চিত্তবিলাস কিংবা অর্থ-সম্পদের প্রাচুর্যে প্রকৃত সফলতা নেই। উভয় জাহানের সফলতা, শান্তি আল্লাহ তাআলার কাছে সম্মানের সনদ অর্জন করার নাম। মানুষের বাহবা পাওয়ার নাম নয়। অনুগত বান্দার কাজই তো হলো সবসময় আল্লাহর অনুগত থাকা, সর্বদা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে সচেষ্ট থাকা। এজন্য প্রয়োজনে নি:শেষে নিজেকে বিলিয়ে দেয়ার জন্য উন্মুখ থাকা। সব ভালোবাসার উপর তাঁর ভালোবাসাকে অগ্রাধিকার দেওয়া এবং যাবতীয় সব স্বার্থের উপর তাঁর স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়া। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'এতদসত্ত্বেও কিছুলোক এমন আছে যারা আল্লাহ তাআলার সাথে আরো কিছুকে শরীক করে রেখেছে। তারা সেগুলোকে এমন ভালোবাসে যেমন ভালোবাসা আল্লাহর সাথে হওয়া উচিৎ ছিল। (সূরা বাকারা, আয়াত ১৬৫) তবে এ পর্যায়ের এখলাস অর্জন করা এবং কুরআনের দাবি অনুযায়ী আমল করা অনেক কঠিন কাজ। তবে একজন মুসলমান হিসেবে চাই তিনি বিশিষ্টজন হোন কিংবা আমজনতা হোন- এতটুকু দায়িত্ব তো অবশ্যই আছে যে, যখন আলো ও আঁধারের মাঝে দ্বন্দ্ব হতে দেখবে, ঈমান ও কুফরের লড়াই হতে দেখবে তখন সে ঈমানের মর্যাদা রক্ষা করে চলবে এবং ইসলামের পক্ষাবলম্বন করবে। এমন সময়েও যে নিজেকে সত্যের জন্য উৎসর্গ করতে না পারবে, নিঃসন্দেহে সে চরম মুনাফেকীর পরিচয় দিল। যে এমন সময়েও দ্বীনের সাহায্যে এগিয়ে আসতে ব্যর্থ হল, নিঃসন্দেহে সে নিজের কপট-মাথায় আল্লাহর অবাধ্যতার কালিমা লেপন করল। এমতাবস্থায় যে জিহাদের ময়দানে অনুপস্থিত থাকলো, নির্ঘাত তার ঈমান ভয়ংকর পরিস্থিতির শিকার। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আপনার কাছে তো তারাই অব্যাহতি চায় যারা আল্লাহর ওপর ও আখেরাতের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে না এবং যাদের অন্তর সন্দেহগ্রস্ত হয়ে পড়েছে ফলে তারা সে সন্দেহের দোলায় দোদুল্যমান।' (সূরা তাওবা, ৪৫)

[ড. সাদেক হোসাইন রচিত 'সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ আওর উনকী তাহরীকে মুজাহিদীন' গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত; পৃষ্ঠা: ৮৫০]



হে যুবক ও তরুণেরা!

-শাইখ আব্দুল্লাহ আয্যাম রহ.

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

"পাঁচটি বিষয় আসার পূর্বেই পাঁচটি বিষয় থেকে সুবিধা গ্রহণ করো, বৃদ্ধ হবার পূর্বেই তারুণ্য-যৌবনাবস্থা থেকে সুবিধা গ্রহণ করো, অসুস্থ হবার পূর্বেই সুস্বাস্থ্য থেকে সুবিধা গ্রহণ করো, দারিদ্রতা এসে যাবার পূর্বেই সম্পদের সদ্ব্যবহার করো, ব্যস্ততা এসে যাবার পূর্বেই অবসর সময়কে কাজে লাগাও এবং মৃত্যু এসে যাবার পূর্বেই 'জীবন' নামক এই নিয়ামতের সঠিক ব্যবহার করো।" (সুনানুল কুবরা লিন নাসায়ী)

তোমার তারুণ্যকে কাজে লাগাও, যৌবনকে কাজে লাগাও, কারণ এখন তুমি নফল সিয়াম পালন করতে সক্ষম হলেও যখন তুমি তোমার বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হবে তোমার প্রয়োজন হবে পুষ্টিকর খাবারের মাধ্যমে মাংস এবং হাড়কে পরিপুষ্ট রাখার তাই তখন তুমি সিয়ামের কষ্টকে প্রতিরোধ করতে পারবে না। বর্তমানে তোমরা যুবক; তোমরা রাতে ঘুম থেকে ওঠে মহান আল্লাহ তাআলার দরবারে রুকু-সিজদাহ করতে পারো, যাতে রুকু-সিজদাহগুলো মহান আল্লাহ তা'য়ালার দরবারে তোমার জন্যে সাক্ষী হয়ে যায়, অন্ধকার কবরে তোমার সঙ্গী হয়। হে আমার ভাইয়েরা! যৌবনকাল হলো জিহাদের সময়, যৌবনকাল হলো এমন একটি সময় যে সময়ে আল্লাহর পথে সচেষ্ট হয়ে নিজেকে উৎসর্গ করা যায়! এই সময়ে তোমার কাঁধে বেশী দায়িত্বের বোঝা চাপেনি। কারণ সম্ভবত তুমি একা অথবা তোমার স্ত্রী এবং সন্তান আছে। আগামীতে, সময় অতিবাহিত হবার সাথে সাথে তোমার দায়িত্ব আরও বাড়বে, দুনিয়ার সমস্যাগুলো তোমাকে ঘিরে ধরবে। তুমি তোমার পরিবার, সন্তান-সন্ততি এবং আত্মীয় স্বজনের সমস্যাগুলো সমাধানের চেষ্টা করবে। এসব কাজগুলো করতে তোমার অনেকটা সময় ব্যয় হয়ে যাবে।

তুমি এখন তোমার শ্রেষ্ঠ বয়সে রয়েছ, যে বয়সে তুমি নিজেকে মুজাহিদ এবং আত্মত্যাগী হিসেবে গড়ে তুলতে পার। আমি প্রায়ই বলে থাকি যে, আমি বিস্মিত হই সেইসব যুবকদের দেখে যারা খুব ভীতু! তাদের কী হয়েছে যে, তারা এতো ভয়কাতর? কী তাদেরকে ভীতসন্ত্রস্ত করে? যদি সে এই বয়সে ভীতু হয় তাহলে আগামীতে কী হবে?

জীবনের সর্বোৎকৃষ্ট সময়ই হলো এই যৌবনকাল। যৌবনকাল হলো সেই সময় যে সময়ে মহান রাজাধিরাজ রাব্বুল আলামীনের সামনে উপস্থিত হবার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা যায়। এ কারণেই আমরা যদি তাদেরকে দেখি যারা আল্লাহর দ্বীনকে প্রথম বিজয়ী করেছিলেন, তাহলে আমরা দেখব তারা প্রত্যেকেই ছিল তরুণ। প্রকৃতপক্ষে, তাদের তিন-চতুর্থাংশ বা চার-পঞ্চমাংশের বয়স ছিল বিশ বছরের নিচে। তারা এমনটি করতে পেরেছিলেন, কারণ যৌবনকালই হলো আল্লাহর পথে প্রচেষ্টা এবং আত্মত্যাগের সময়।

সহীহাইনে উল্লেখ আছে যে, আব্দুর রহমান বিন আউফ রাযি. বর্ণনা করেছেন, 'বদরের ময়দানে আমি যখন সামরিক সৈন্য বেশে দাঁড়িয়ে ছিলাম এমতাবস্থায় হঠাৎ ডানে এবং বামে দুজন তরুণ দেখতে পেলাম যাদের বয়স বয়ঃসন্ধিকালের কিছুটা কম অথবা বেশী। তাদের উপস্থিতিতে আমি নিজেকে নিরাপদ মনে করতে পারলাম না। একটি তরুণ এগিয়ে এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, হে চাচা! আবু জাহেল কোথায়? আমিও তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তার কাছে তোমার কী দরকার? মনে মনে ভাবলাম, এই বালক জাহেলদের নেতা আবু জাহেলের কথা জিজ্ঞাসা করছে কেন? এরপর বালকটি উত্তর দিলো, আমি শুনেছি, সে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনেক কষ্ট দিয়েছে। তাই আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, 'আমি যদি তাকে দেখতে পাই, আমার ছায়া তাকে অতিক্রম করবে না, যতক্ষণ না আমি তাকে হত্যা করি কিংবা সে আমাকে হত্যা করে।' তিনি বলেছেন, 'আমি তার এ কথায় একদম অবিভূত হলাম!'

তারপর, অপর কিশোর বালক আমার কাছে আসল। সে-ও আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, হে চাচা! আবু জাহেল কোথায়? আমিও তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তার কাছে তোমার কী দরকার? বালকটি উত্তর দিলো, আমি শুনেছি, সে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনেক কষ্ট দিয়েছে, নির্যাতন করেছে। তাই আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, 'আমি যদি তাকে দেখতে পাই, আমার ছায়া তাকে অতিক্রম করবে না, যতক্ষণ না আমি তাকে হত্যা করি কিংবা সে আমাকে হত্যা করে।'

তারপর আমি প্রত্যক্ষ করলাম যে, 'আবু জাহেল সামান্য দূরে লোকজনদের মাঝে বিচরণ করছে। আমি তাদেরকে বললাম, ঐ হলো সেই ব্যক্তি যাকে তোমরা খুঁজছো। এই কথা বলার পর আমি আকাঙ্ক্ষা করছিলাম আমি যদি এই তরুণদের মত উৎসাহী এবং উদ্যমী হতে পারতাম। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে তারা ফিরে আসল এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট প্রত্যাবর্তন করল।'

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের মধ্যে কে তাকে হত্যা করেছো?'

মুয়ায বিন আমর ইবনুল জামুহ বললেন,'আমি হত্যা করেছি', মায়ায বিন আফরা বললেন,'আমি হত্যা করেছি।'

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় বললেন, 'তোমরা কি তোমাদের তরবারী পরিষ্কার করে ফেলেছো?' তারা বললেন, 'না'। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আমাকে দেখাও'। উভয়ের তরবারীতে রক্ত দেখতে পেয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা উভয়ে তাকে হত্যা করেছো।'

মুয়ায বিন আমর বিন জামুহ বলেছেন, 'আমি আবু জাহেলকে আমার লক্ষ্যের কেন্দ্রবিন্দুতে নিলাম এবং তাকে চোখে চোখে রাখলাম। তারপর যখন সুযোগ পেয়ে গেলাম, তখনই আক্রমণ করে বসলাম এবং এমনভাবে আঘাত করলাম যে, তার পা দ্বিখন্ডিত হয়ে গেল। এদিকে আমি যখন আবু জাহলকে আঘাত করলাম তখন তার ছেলে ইকরামা আমার কাঁধে তরবারীর আঘাত করল এবং তাতে আমার হাত কেটে গিয়ে চামড়ার সঙ্গে ঝুলে গেল এবং যুদ্ধের জন্য প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াল। আমি তাকে পিছনে টেনে সাধারণভাবে যুদ্ধ করতে থাকলাম। কিন্তু সে যখন আমাকে খুবই কষ্ট দিতে লাগল, তখন আমি তার উপর আমার পা রেখে জোরে টান দিয়ে তাকে বিচ্ছিন্ন করে ফেললাম।

এরপর আবু জাহেলের নিকট পৌঁছে যান মায়ায বিন আফরা। তিনি তাকে এত জোরে আঘাত করেন যে, সে সেখানেই নিথর হয়ে যায়। সে সময় শুধু তার শ্বাস-প্রশ্বাসটুকু অবশিষ্ট ছিল।"

যখন যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "কে আছো এমন, যে দেখে আসবে আবু জাহেলের অবস্থা কী হল। আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযি. তখন সৈন্যদের মধ্যে অনুসন্ধান চালিয়ে আবু জাহেলকে খুঁজে পেলেন। আবু জাহেল তখন মৃতপ্রায় অবস্থায় ছিলো। এমতাবস্থায় আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ তার বুকের ওপর ওঠে বসলেন। এরপর, আবু জাহেল চোখ খুলে দেখলো আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ তার বুকের ওপর। এতে আবু জাহেল অপমানবোধ করে বললো, 'তুমি মক্কায় রাখাল ছিলে না?' ইবনে মাসউদ বললেন, 'হে আল্লাহর দুশমন! আমি অবশ্যই মক্কাতে রাখাল ছিলাম'। আবু জাহেল বললো- হে উটপালক! তুমি অনেক বড় স্থানে চড়ে বসেছো। এত বড় সম্মানিত উচ্চাসনে এর আগে কেউ বসেনি। ইবনে মাসউদ বললেন, 'আজকে কার দিন? আজকে কে বিজয়ী হয়েছে? আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল বিজয়ী হয়েছেন।"

আমি বলি, 'এই হলো আবু জাহেল। দুনিয়াতে যার অস্তিত্বকে নিঃশেষ করেছে দুই তরুণ। তরুণেরা এই কাজ করেছিলো তরুণাবস্থায়। তাদের বয়স ১৭ বছরের কাছাকাছি হবে। এর অর্থ দাঁড়ায় তারা বড়জোর হাইস্কুলের ছাত্র হবে!! এই বয়সেই তারা কুরাইশদের সম্ভ্রান্ত নেতা আবু জাহেলের মোকাবেলা করেছে এবং আবু জাহেলকে হত্যা করেছে। এবং আবু জাহেলের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ায় মহানবী সা. এর মনে আনন্দের জোয়ার বয়ে গিয়েছিল। আর কেউ যদি বদর, মুতা প্রভৃতি যুদ্ধের দিকে খেয়াল করে তাহলে তরুণ-যুবক ছাড়া কাউকে খুঁজে পাবে না।



কল্যাণের পথে এসো

-শায়েখ খালেদ হুসাইনান রহ.

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (10) تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (11) يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (12)

[الصف: 10 - 12]﴾

অর্থঃ হে ঈমানদারগণ! আমি কি তোমাদের এমন এক সওদার সন্ধান বলে দেব, যা তোমাদের জাহান্নামের মর্মন্তুদ শাস্তি থেকে মুক্তি দেবে? তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করবে। অতঃপর নিজ জান-মাল ব্যায় করে আল্লাহর রাহে জিহাদ করবে। এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর যদি তোমরা বুঝ। কারণ এর ফলে আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় অপরাধ মাফ করে দিবেন এবং তোমাদের এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার তলদেশ দিয়ে নহর প্রবাহিত হয়। তাছাড়া এমন পবিত্র বাসস্থানও তোমাদের দিবেন যা আদ্‌ন্ জান্নাতে অবস্থিত। এটা কতই না মহান সফলতা। (সূরা সফ, আয়াত ১০-১২)

জিহাদ : জান্নাতের সংক্ষিপ্ত পথ

তাবেঈ হাসান বসরী রহ. বলেন, প্রত্যেক গন্তব্যেরই সংক্ষিপ্ত পথ রয়েছে। আর জান্নাতের সংক্ষিপ্ত পথ হচ্ছে জিহাদ।

জিহাদঃ প্রকৃত ভালবাসার প্রমাণ

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, যার মাঝে জিহাদের প্রতি আকর্ষণ নেই সে আল্লাহকে ভালবাসার হক আদায় করেনি; বরং তার মাঝে নিফাকের কালিমা রয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'নিশ্চয়ই মুমিন তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সা. এর ওপর ঈমান এনেছে। অতঃপর আর সন্দেহগ্রস্ত হয়নি এবং নিজেদের জান-মাল বিকিয়ে দিয়ে আল্লাহর রাহে জিহাদ করেছে। তারাই হলো ঈমানের দাবিতে সত্যবাদী'।
(সূরা হুজরাত, আয়াত ১৫)

জিহাদঃ দুনিয়া আখেরাতের কল্যাণের উৎস

শায়খুল ইসলাম আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, জেনে রেখো! জিহাদের মাঝেই নিহিত রয়েছে দুনিয়া আখেরাতের প্রকৃত কল্যাণ। আর দুনিয়া আখেরাতের দূর্ভাগ্যের কারণও এটা পরিত্যাগ করা। আল্লাহ তাআলা বলেন, **'হে নবী! আপনি বলে দিন, 'তোমরা তো আমাদের ব্যাপারে দু'টি সফলতার যে কোন একটিরই অপেক্ষায় আছো'। অর্থাৎ, হয় সাহায্য ও বিজয়ের, অথবা শাহাদাত ও জান্নাতের।'** সুতরাং মুজাহিদগণ বেঁচে থাকলেও সম্মানিত। কারণ, তাঁর জন্য রয়েছে পার্থিব জগতের সওয়াব। আর আখেরাতের প্রতিদান তো আরো উত্তম। আর যদি তাঁরা শহীদ হন কিংবা স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেন, তাহলে তাঁর গন্তব্য জান্নাত।

শহীদের বৈশিষ্টাবলী

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللَّهِ سِتُّ خِصَالٍ: يُغْفَرُ لَهُ فِي أَوَّلِ دَفْعَةٍ، وَيَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ، وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ، الْيَاقُوتَةُ مِنْهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَيُزَوَّجُ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، وَيُشَفَّعُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَقَارِبِهِ

রাসূল সা. বলেন, শহীদরা আল্লাহর পক্ষ থেকে ছয়টি বৈশিষ্ট্য লাভ করবে। ১. আল্লাহ তাআলা তাঁর গুনাহ মাফ করে দিবেন। ২. জান্নাতে নিজ বাসস্থান কোথায় হবে আগেই তা দেখতে পাবে। (যার ফলে সে চিন্তামুক্ত থাকবে।) ৩. কবরের আযাব থেকে মুক্তি পাবে। ৪. মহাপ্রলয়ের ভয়াবহতা তাকে স্পর্শ করবে না। ৫. ইয়াকুত পাথরের নির্মিত সম্ভ্রান্ত মুকুট তাকে পরানো হবে। দুনিয়া ও দুনিয়ার যাবতীয় বস্তু মিলিয়েও যার সমমূল্য হবে না। ৬. বাহাত্তরজন ডাগরআঁখি বিশিষ্ট হুরের সাথে তাঁর বিবাহ পরানো হবে এবং সত্তরজন নিকটাত্মীয়র ক্ষেত্রে তাঁর সুপারিশ গ্রহণ করা হবে। (তিরমিযী)

শহীদের আশ্চর্য তামান্না:

قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ أَحَدٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا، وَأَنَّ لَهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ، غَيْرُ الشَّهِيدِ، فَإِنَّهُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ، فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ، لِمَا يَرَى مِنَ الْكَرَامَةِ»

রাসূল সা. বলেন, কোন জান্নাতীকে দুনিয়ার সবকিছু দিয়ে দিলেও সে দুনিয়ামুখি হওয়ার কল্পনাও করবে না; একমাত্র শহীদ ব্যতীত। শহীদ ব্যক্তি কামনা করবে দুনিয়ায় ফিরে আসার এবং পর্যায়ক্রমে দশবার আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হওয়ার। কারণ এর মাঝে সে অলৌকিক বিষয় প্রত্যক্ষ করেছে। (বুখারী, মুসলিম)

জিহাদঃ প্রকৃত জীবনের গ্যারান্টি

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ [الأنفال: 24] ﴾

অর্থঃ "হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সা. এর আহ্বানে সাড়া দাও যখন তাঁরা তোমাদের এমন বিষয়ের দিকে আহ্বান করে যা তোমাদের অমর জীবন দান করবে।" (সূরা আনফাল, আয়াত ২৪)

আল্লামা ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন, জিহাদই হল ঐ মহান ইবাদত যা মানুষকে দুনিয়ার জীবনে, বরযখে এবং পরকালে অফুরন্ত জীবনের নিশ্চয়তা দান করে। দুনিয়ায় জিহাদের মাধ্যমে প্রকৃত জীবন এভাবে অর্জন হয় যে, মুসলমানদের শক্তি ও শত্রুর ক্ষতি ও ভীতি জিহাদের মধ্যেই নিহিত।

আর বরযখ জগতে প্রকৃত জীবন কীভাবে লাভ হয় এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ [آل عمران: 169] ﴾

অর্থঃ 'যারা আল্লাহর রাহে নিহত হয়েছে তাদের তোমরা মৃত জ্ঞান করো না। তারা তো জীবিত তাদের রবের কাছে এবং রিযিক প্রাপ্ত'। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৬৯)

আর পরকালের অনাবিল ও অফুরন্ত জীবনও এর মাধ্যমেই অর্জিত হয়। কারণ, পরকালে মুজাহিদ ও শহীদগণের ভোগ-বিলাস ও সুখ-শান্তি অন্যদের চেয়ে বেশিই হবে। মুজাহিদের অসামান্য প্রতিদানের ব্যাপারে রাসূল সা. এরশাদ করেন, 'অবশ্যই আল্লাহর পথে তোমাদের অবস্থান নিজগৃহে থেকে ৭০ বছর নামাযরত থাকার চেয়ে উত্তম। তোমরা কি এটা কামনা করোনা যে, আল্লাহ তাআলা তোমাদের ক্ষমা করে দিক এবং তোমাদের জান্নাত দান করুক? তোমরা আল্লাহর রাহে জিহাদ করো। কারণ, যে আল্লাহর রাহে উষ্ট্রীর দুধ দোহন বিরতি সামান্য সময় পরিমাণ সময়ও যুদ্ধ করলো তাঁর জন্য জান্নাত আবশ্যক হয়ে পড়লো। (তিরমিযী)

কোন ইবাদত জিহাদের সমকক্ষ হতে পারে না

রাসূল সা. এর কাছে সাহাবায়ে কেরাম জানতে চাইলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এমন কী ইবাদত রয়েছে যা জিহাদের সমকক্ষ হতে পারে? তিনি বললেন, তোমরা তার সমকক্ষ ইবাদত করতে সক্ষম হবে না। একথা বলার পর সাহাবারা পুনর্বার কিংবা দ্বিতীয় এবং তৃতীয়বারও জানতে চাইলেন, সে ইবাদত সম্পর্কে যা জিহাদের সমকক্ষ হতে পারে। তবে তিনি প্রতিবারই বললেন, তোমরা তা করতে পারবে না। পরিশেষে তিনি বললেন, আল্লাহর পথের মুজাহিদের দৃষ্টান্ত হল ঐ ব্যক্তি, যে সর্বদা রোযা অবস্থায় থাকে, নামাযরত থাকে, তিলাওয়াতে নিমগ্ন থাকে, রোযা ও সালাত পালনে ক্লান্ত-বিরক্ত হয় না। এভাবে অবিরতভাবে ইবাদত করতে থাকে। মুজাহিদ আল্লাহর রাস্তা হতে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত। (বুখারী ও মুসলিম)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মান ও মর্যাদা

-শায়খ মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান আল আরেফী





আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বিশ্বজগত সৃষ্টি করার পর সৃষ্টিজীবের প্রতি দৃষ্টি ফিরিয়েছেন। অতঃপর তাদের মধ্য থেকে সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বোত্তম লোকদের আলাদা করে নবী রাসূল হিসেবে মনোনীত করেছেন এবং তাঁদেরকে সকল জাতির উপর সম্মানিত ও মর্যাদাবান করেছেন। এবং সকলকেই তাদের সম্মান করতে আদেশ করেছেন। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে হেদায়াতের গুণে গুণান্বিত করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ ﴾

অর্থ: "তাদেরকে আল্লাহ সুপথগামী করেছেন, অতএব তুমি তাদের পথই অনুসরণ কর। (সূরা আনআম, আয়াত ৯০)

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন,

كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ [البقرة: 285]﴾

অর্থ: "সবাই আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি ও তাঁর রাসূলদের প্রতি ঈমান এনেছে (তারা বলেছে) আমরা তাঁর রাসূলদের মধ্যে কারো সাথে কারো তারতম্য করি না।"(সূরা বাকারা, ২৮৫)

সুতরাং আমরা যেমনিভাবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনি এবং তাঁকে ভালোবাসি তেমনিভাবে অন্যান্য নবী রাসূলদের প্রতি ঈমান আনি এবং তাদেরকে ভালোবাসি। কারণ তারা সকলেই সত্যবাদী, পবিত্র এবং তাঁরা সকলেই আল্লাহর নবী এবং আল্লাহর নিকট তাদের মর্যাদা অনেক উর্ধ্বে। কারো এই অধিকার নেই যে, আল্লাহর কোন একজন নবীরও অমর্যাদা করবে। যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহর কোন একজন নবীর অমর্যাদা করে এবং তাঁকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে তাহলে আমরা তার প্রতি ক্রুদ্ধ ও রাগান্বিত হবো এবং তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তার প্রতি শত্রুতা পোষণ করবো। আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হওয়া সত্ত্বেও আমরা নবীদের মাঝে শ্রেষ্ঠত্বের তারতম্য করবো না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُخَيِّرُوا بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ

অর্থ: "তোমরা নবীদের কাউকে শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তিতে অন্যের উপর প্রধান্য দিও না ।" (সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৮৪৫)

একবার এক ইহুদী এক সাহাবীর সামনে মুসা আ. এর প্রশংসা করলে সাহাবী ঐ ইহুদীকে থাপ্পড় মারলেন। অতঃপর সে ইয়াহুদী রাসূলুল্লাহ সা. এর নিকট অভিযোগ করল। রাসূলুল্লাহ সা. রাগান্বিত হয়ে বললেন,

لَا تُفَضِّلُوا بَيْنَ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ

অর্থ: "তোমরা আল্লাহর নবীদের মাঝে শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তিতে কাউকে প্রধান্য দিওনা।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল নবীর মর্যাদা রক্ষা করে কথা বলতেন। আল্লাহ তাআলা আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামসহ সকল নবীকেই ভালোবাসতে ও অনুসরণ করতে আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ [النساء: 64] ﴾

অর্থ: "আমি তো প্রত্যেক রাসূলকে এজন্যই পাঠিয়েছি যে, মানুষ আল্লাহর নির্দেশমত তার আনুগত্য করবে।" (সূরা নিসা, আয়াত ৬৪)

আল্লাহ তাআলা কোরআনে কারীমের ২৫টিরও বেশী স্থানে তাঁর আনুগত্যের সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করতে বলেছেন। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ [النساء: 59] ﴾
﴿ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ [آل عمران: 32] ﴾
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ [الأنفال: 20] ﴾
﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ [النساء: 69] ﴾

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সম্মান ও মর্যাদা কিভাবে করতে হবে? আল্লাহ তাআলা কোরআনে কারীমে তা শিক্ষা দিয়ে বলেছেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [الحجرات: 1] ﴾

অর্থ: "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সামনে কোন কিছু এগিয়ে দিওনা (অর্থাৎ তাদের আগে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিওনা)। আর আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব কিছু শোনেন, সবকিছু জানেন। (সূরা হুজরাত, আয়াত ১)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ} [الحجرات: 2] ﴾

অর্থ: "হে ঈমানদারগণ! তোমরা নবীর কন্ঠস্বরের উপর নিজেদের কন্ঠস্বর উঁচু করো না এবং নিজেরা একে অন্যের সাথে যেভাবে জোরে কথা বল সেভাবে তাঁর সাথে জোরে কথা বলো না। তাতে তোমাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে তোমরা তা টেরও পাবে না।" (সূরা হুজরাত, আয়াত ২)

আল্লাহ তাআলা কোরআনে কারীমে মু'মিনদের একটি জামাতের প্রশংসা করেন, যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পূর্ণ মর্যাদা রক্ষা করেছেন এবং তাঁরা তাঁর পরিপূর্ণ আনুগত্য করেছেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ} [الحجرات: 3] ﴾

অর্থ: "যারা আল্লাহর রাসূলের নিকট নিজেদের কন্ঠস্বর নিচু রাখে আল্লাহ তাদের অন্তর তাকওয়ার জন্য পরীক্ষা করেছেন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা আর বড় এক পুরস্কার।" (সূরা হুজরাত, আয়াত ৩)

সাহাবায়ে কেরাম রাযি. যখন রাসূল সা. কে সম্বোধন করে কোন কিছু বলতেন, তখন তাঁর পরিপূর্ণ সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করে কথা বলতেন, যেমন তারা বলতেন, يا رسول الله (হে আল্লাহর রাসূল!) يا نبي الله (হে আল্লাহর নবী!) ইত্যাদি। তারা তাকে يا محمد (হে মুহাম্মাদ!) বলে সম্বোধন করতেন না কারণ এভাবে সম্বোধন করা তাঁর জন্য অসম্মানের বিষয়। আর এটা হারাম। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا [النور: 63] ﴾

অর্থ: "তোমরা একে অন্যকে যেভাবে সম্বোধন কর সেভাবে রাসূলকে সম্বোধন করো না।" (সূরা নূর, আয়াত ৬৩)

আল্লাহ তাআলা আমাদের নবী মুহাম্মাদ সা. কে মানব ও জ্বিন জাতির জন্য নবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন। তাঁর মাধ্যমেই রিসালাতের ধারাবাহিকতা শেষ হয়েছে। তিনি সবচেয়ে সম্মানিত ও সর্বশ্রেষ্ঠ মানব। তিনি আল্লাহর অতি প্রিয় ও তাঁর বন্ধু। তিনি শাফিউল মুশাফ্‌ফা। আল্লাহ তাআলা জান্নাতের দরজা প্রথমে তাঁর জন্যই খুলবেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রত্যেকটি কাজের প্রশংসা করেছেন। যেমন আল্লাহ তাআলা তাঁর আকলের (জ্ঞানের) প্রশংসা করে বলেন, مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى তাঁর জবানের প্রশংসা করে বলেন, مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى তাঁর সাথীর প্রশংসা করে বলেন, عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ,
তাঁর দৃষ্টির প্রশংসা করে বলেন, مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى
তার বক্ষের প্রশংসা করে বলেন, أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ
তাঁর চরিত্রের প্রশংসা করে বলেন, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ

অতএব যারা আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দিবে, অবশ্যই তিনি তাদের কঠিন শাস্তি দিবেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [التوبة: 61] ﴾

অর্থ: "যারা আল্লাহর রাসূল সা. কে কষ্ট দেয় তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক আযাব। (সূরা তাওবা, আয়াত ৬১)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا [الأحزاب: 57] ﴾

অর্থ: "যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দেয় আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে অভিশপ্ত করেন। তিনি তাদের জন্য লাঞ্ছনাকর শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন।" (সূরা আহযাব, আয়াত ৫৭)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ [المجادلة: 5] ﴾

অর্থ: “যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচারণ করবে, তাদেরকে লাঞ্ছিত করা হবে, যেমন লাঞ্ছিত করা হয়েছে তাদের পূর্ববর্তীদেরকে। আমি সুস্পষ্ট আয়াত নাযিল করেছি। আর কাফেরদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাকর শাস্তি। (সূরা মুযাদালা, আয়াত ৫)

আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা দাওয়াতের ময়দানে অবিচল থেকেছেন। তিনি কখনো তিরস্কারকারীর তিরস্কারের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেননি। কারণ, তিনি জানতেন, সূর্যকে তিরস্কার করে তার দিকে থু থু নিক্ষেপ করলে নিজের দিকেই ফিরে আসবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কখনো কখনো তিরস্কার করে যাদুকর, গণক আবার কখনো মিথ্যাবাদী বলা হত।

আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সান্তনা দিয়ে বলেন,

﴿ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ . إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ [الحجر: 95-94] ﴾

অর্থ: “অতএব তোমাকে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা প্রকাশ্যে ঘোষণা কর এবং মুশরিকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও। বিদ্রুপকারীদের বিরুদ্ধে তোমার জন্য আমিই যথেষ্ট। (সূরা হিজ্‌র, আয়াত ৯৪-৯৫)

আল্লাহর কসম! আমাদের নবী আমাদের কাছে অনেক প্রিয়। এমনকি আমাদের জান-মাল, ছেলে-সন্তান, পরিবার পরিজন, আত্মীয়স্বজন এবং সব মানুষের চেয়ে অধিক প্রিয়।

আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

অর্থ: “ঐ সত্ত্বার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ, তোমাদের কেউ ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার নফস, তার সন্তান তার পিতা-মাতা তার পরিবার এবং সব মানুষ থেকে অধিক প্রিয় হই। (বুখারী)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মানে মহান আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا [الأحزاب:56] ﴾

অর্থ: “আল্লাহ নবীকে অনুগ্রহ করেন, তাঁর ফেরেশতারাও তাঁর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করে। (অতএব) হে ঈমানদারগণ! তোমরা তাঁর জন্য (আল্লাহর অনুগ্রহ) প্রার্থনা কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও।” (সূরা আহযাব, আয়াত ৫৬)

আল্লাহ তাআলা আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমন কিছু সাথী দিয়েছিলেন, যারা তাঁর সম্মান ও মর্যাদা ভালোভাবে জানতেন এবং তাকে পরিপূর্ণ ইজ্জত ও সম্মান করতেন এবং তাদের অন্তরে তাঁর ভালোবাসা ছিল প্রবল। হযরত আলী রাযি. এর নিকট রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি তাঁদের ভালোবাসা সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আল্লাহর কসম! তিনি আমাদের নিকট আমাদের জান-মাল, সন্তান-সন্ততি, পিতা-মাতা, এমনকি প্রচন্ড গরমে তৃষ্ণার্ত ব্যক্তির নিকট ঠাণ্ডা পানির চেয়েও অধিক প্রিয় ছিলেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন মুনাফিক সর্দার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এর এক মজলিসের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। মজলিসে মুনাফিকরা ছাড়াও কয়েকজন সাহাবী উপস্থিত ছিলেন। তখন মুনাফিক সর্দার ইবনে উবাই তার দুর্গন্ধযুক্ত পাগড়ির কোনা দিয়ে তাঁর পঁচা নাক চেপে ধরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করে বলল, তুমি আমাদের থেকে দূরে থাক। আমাদের এখানে ধূলি উড়িও না। তোমার গাধার দুর্গন্ধে আমাদের কষ্ট হচ্ছে। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাইফা রাযি. দাঁড়িয়ে বলল, “আল্লাহর কসম! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গাধার গন্ধ তোর চেয়ে পবিত্র, সুগন্ধযুক্ত এ বলে তার মাথায় আঘাত করলেন।

একজন অন্ধ সাহাবীর একজন দাসী ছিল। দাসীটি তার উম্মে ওয়ালাদ ছিল। এই উম্মে ওয়ালাদ থেকে তার মুক্তার মত সুন্দর দুটি ফুটফুটে বাচ্চা সন্তান ছিল। সে তাঁর প্রতি খুবই সহানুভুতিশীল ছিল এবং আন্তরিকভাবে তার খিদমত করতো। কিন্তু মহিলাটি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালিগালাজ করতো, তাঁকে অভিশাপ দিত। এই সাহাবী তাকে বারবার সাবধান করার পরও সে বিরত হতো না। এক রাতে মহিলাটি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অভিশাপ দিয়েই যাচ্ছিলো। তখন তিনি একটি ছুরি নিয়ে তার পেটে বিদ্ধ করে মৃত্যু হওয়া পর্যন্ত চাপ দিয়ে ধরে রাখলেন।

সকালে মহিলাটির নিহত হওয়ার সংবাদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের একত্র করে বললেন, আমি আল্লাহর নামে তোমাদের আদেশ করছি! যে কাজটি করেছো দাঁড়াও! অন্ধ সাহাবী দাঁড়ালেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে অগ্রসর হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমিই এ কাজ করেছি। এই মহিলা আমার উম্মে ওয়ালাদ দাসী। সে আমাকে অনেক ভালোবাসতো এবং তার থেকে আমার দুটি মুক্তার মত সুন্দর শিশু সন্তান আছে। কিন্তু সে আপনার কুৎসা রটাতো এবং আপনাকে অভিশাপ দিত। আমি তাকে সতর্ক করা সত্ত্বেও সে সতর্ক হয়নি। গত রাতে সে আপনাকে অভিশাপ দিয়েই যাচ্ছিল। তাই একটি ছুরি নিয়ে আমি তাকে আঘাত করে হত্যা করেছি।

অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, জেনে রাখো! তার রক্তের কোন মূল্য নেই। অর্থাৎ তার জন্য কোন ক্ষতিপূরণ নেই এবং যে তাকে হত্যা করেছে তারও কোন শাস্তি নেই। হ্যাঁ, যে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দিবে তার জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি।

যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবমাননার কোন বিষয় আসবে তখন মুসলমানদের অবস্থা এমনই হওয়া উচিত। মক্কায় আব্দুল্লাহ ইবনে খাতাল নামক এক লোক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালিগালাজ করতো এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে কবিতা রচনা করতো। এ ব্যাপারে তাকে সতর্ক করা হয়েছে; কিন্তু সে সতর্ক হয়নি। উপরন্তু সে তার দুজন দাসীকে টাকা-পয়সা দিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালিগালাজ করার এবং তাঁর বিরুদ্ধে কবিতা আবৃত্তি করার জন্য। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের পর ঘোষণা করলেন, "যে নিজ গৃহে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ, যে মসজিদে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ। এক সাহাবী হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি ঘোষণা দিয়েছেন, যে মসজিদে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ। কিন্তু ইবনে খাতালের কী হবে? সে তো কাবার গিলাফ ধরে ঝুলে আছে। অথচ সে আপনাকে গালিগালাজ ও অভিশাপ দিত। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাগের স্বরে তাকে বললেন, إذهبوا فاقتلوه, "যাও তাকে হত্যা কর।"

আবূ মুআবিয়া আদ্দারী বলেন, আমি একবার বাদশাহ হারুনূর রশীদকে হাদীস শুনাচ্ছিলাম। তাঁর সামনে হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে আমি যতবারই قال رسول الله (আল্লাহর রাসূল বলেছেন) ও قال النبي (নবীজি বলেছেন) বলতাম ততবারই তিনি বলেছেন, قال مولاى (আমার মাওলা 'মনিব' বলেছেন) ও قال سيدى (আমার সর্দার বলেছেন)।

আমি দীর্ঘ এক হাদিস বর্ণনা করতে গিয়ে বললাম, التقى آدم موسى তখন বাদশার চাচা আমাদের কাছে আসল এবং একটু তাচ্ছিল্যের স্বরে বলল, কোথায় কোথায় তাদের সাক্ষাত হয়েছিল? একথা শুনে হারুনূর রশীদের চেহারা রাগে লাল হয়ে গেল এবং ক্রোধান্বিত হয়ে বললেন, তাকে এখান থেকে নিয়ে যাও। অতঃপর সে তাকে সেখান থেকে বের করে জেলে বন্দি করলেন এবং তাকে হত্যার আদেশ দিলেন।

আবূ মুআবিয়া বলেন, আমি তখন বাদশার নিকট এসে কসম করে বললাম যে, সে ঠাট্টা ও নিন্দার উদ্দেশ্যে বলেনি; বরং সে শুধু জানতে চেয়েছে। তখন হারুনূর রশীদ বললেন, এটা যদি সত্য হয় তাহলে তাকে বের করে আন এবং তাকে আদব শিক্ষা দাও। আমি তো ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম যে, সে এমন কথা ঐ সকল অমুসলিমদের থেকে শুনেছে যারা সায়্যিদুনা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দেয়।

আহমদ শাকের রহ. বলেন, মিশরে এক বিশুদ্ধভাষী অনলবর্ষী খতীব ছিল। একদিন খুতবার সময় মসজিদে এক আমির আসল। তখন সে তার (আমীরের) প্রশংসা করতে গিয়ে বলে, أن جاءه الأعمى ما عبس في وجهه وماتولى

"তার নিকট অন্ধলোক আসল, সে ভ্রুকুটি করেনি এবং মুখ ফিরিয়ে নেয়নি।"

সে ঐ আমীরের প্রশংসা করেছে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিন্দা করেছে। নামাজ শেষে আহমদ শাকের রহ. দাড়িয়ে ঘোষণা করলেন, আপনারা নিজ নিজ স্থানে অবস্থান করুন, কেউ মসজিদ থেকে বের হবেন না। আপনারা আপনাদের নামাজ পুনরায় আদায় করুন। আপনাদের নামাজ হয়নি। কারণ আপনারা একজন মুরতাদের পিছনে নামাজ পড়েছেন। সে (খতিব) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিন্দা করার কারণে মুরতাদ হয়ে গেছে।

আহমদ শাকের রহ. বলেন, অল্প দিন পরই তার খুব খারাপ পরিণতি হল। তার অবস্থার এতই অবনতি হল যে, সে এক-দুই টাকার জন্য মসজিদে মসজিদে মানুষের জুতা সোজা করতো, অর্থাৎ মসজিদের খাদেমের চেয়েও নিম্নমানের কাজ। একবার ভাবুন! মসজিদের খাদেমের চেয়েও নিম্নমানের কাজ, এটা কেন হল?

কাজী ইয়াজ রহ. শিফা নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেন, কাইরাওয়ানে ইবরাহীম আল ফিযায়ী নামক উঁচু মাপের এক কবি ছিল। কিন্তু সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করতো। ফলে কাজী হুয়াই ইবনে ওমর তাকে হত্যার আদেশ দেন। অতঃপর কায়রাওয়ানের ফকীহগণ এ কথার ওপর একমত হয়েছেন যে, তাকে ইরতিদাদের ভিত্তিতে হত্যা করা হবে। সুতরাং হত্যার জন্য যখন তাকে উল্টো করে শূলে চড়ানো হল। তখন তার পিঠ ছিল কিবলার দিকে। উপস্থিত লোকেরা তাকে কিবলামুখি করার জন্য বার বার কাঠ ঘুরিয়ে দিচ্ছিল, কিন্তু যত বারই তারা কাঠ ঘুরাচ্ছিল ততবারই তা অন্যদিকে ঘুরে যাচ্ছিল এবং এ অবস্থায়ই তার মৃত্যু হয়ে যায়।

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ বর্ণনা করেন, প্রসিদ্ধ ইহুদি নেতা কা'ব ইবনে আশরাফ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ব্যঙ্গ করে কবিতা রচনা করতো। তখন রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের উদ্দেশ্য করে বললেন ,

من لى بكعب إبن الأشرف فإنه قد أذى الله ورسوله

"কে আছে এমন যে কা'ব ইবনে আশরাফের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। কেননা সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দিচ্ছে।" রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই আহবান শুনে মুহাম্মদ বিন মাসলামা রাযি. বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনি কি চান যে, আমি তাকে হত্যা

করি? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যা! আমি চাই তাকে হত্যা করা হোক। অতঃপর মুহাম্মদ বিন মাসলামা রাযি. তাকে হত্যা করে তবেই ক্ষান্ত হলেন।

আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় এক লোক খ্রিষ্টান ধর্ম ছেড়ে ইসলাম গ্রহণ করে। অতঃপর সে ওহী লেখার মত মহান দায়িত্ব পায়। কিন্তু সে একবার ইহুদীদের এক মজলিসে গিয়ে মুরতাদ হয়ে গেল এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বদনাম শুরু করল এবং বলতে লাগল "আমি যা লিখতাম তাছাড়া মুহাম্মাদ কিছুই জানেনা। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বিরুদ্ধে দোয়া করে বললেন, اللهم اجعله آية হে আল্লাহ তাকে তুমি মানুষের জন্য নিদর্শন বানাও।

এর কিছুদিন পর তার মৃত্যু হল এবং লোকেরা তাকে দাফন করল। পরদিন সকালে দেখা গেল লোকটি মাটির ওপরে পড়ে আছে। তখন লোকেরা বলল, নিশ্চয়ই এ কাজ মুহাম্মাদ ও তার সাথীরা করেছে। অতঃপর তারা আগের চেয়ে বেশী গর্ত করে তাকে আবার দাফন করল। এর পরদিন সকালেও তার একই অবস্থা দেখা গেল। এবারও লোকেরা বলল, নিশ্চয় এ কাজ মুহাম্মাদ ও তার সাথীরাই করেছে। অতঃপর তারা আগের চেয়ে যতটুকু সম্ভব বেশী গর্ত করে তাকে দাফন করল। কিন্তু পরদিন একই ঘটনা ঘটল। এবার লোকেরা বলল এটা কোন মানুষের কাজ হতে পারে না। তারা তাকে ঐ অবস্থায়ই রেখে দিল। কিছুক্ষণ পর একটি কুকুর এসে দুপা উঁচু করে তার মুখে পেশাব করে দিল।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেদায়েতের বাণী পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে দিতে বিভিন্ন রাজা-বাদশাহদের নিকট চিঠি পাঠালেন। পারস্য সম্রাট কিসরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চিঠির অসম্মান করে ছিড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে দিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সংবাদ শুনে বললেন, اللهم مزقه ومزق ملكه হে আল্লাহ আপনি তাকে ও তার সাম্রাজ্যকে টুকরো টুকরো করে দিন। এর কিছু দিন পরই সেও তার সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে গেল।

অন্যদিকে বাইজানটাইন সম্রাট হিরাক্লিয়াস রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চিঠি সম্মান করে নিরাপদ পবিত্র স্থানে রাখলেন। এ সংবাদ শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

فإنه حفظ الكتاب فلن يزال الناس يجدون منه القوة مادام في العيش خير

'সে আমার চিঠির সম্মান করেছে। যতদিন পর্যন্ত সে কল্যাণের উপর থাকবে তার দাপট বাকি থাকবে।'

আজ ইসলাম আবির্ভাবের এতো বছর পরও যখন দলে দলে মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছে। তখন ইসলাম বিদ্বেষী কিছু মানুষ ইসলামের প্রতি বিদ্বেষপোষণ করে ইসলাম ধর্ম ও ইসলামী শিক্ষার সমালোচনা করছে। কখনো কোরআনের অবমাননা করে কোরআন পুড়ে ফেলছে। আবার কখনো তারা আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঠাট্টা বিদ্রুপ করছে।

কয়েক দিন পূর্বে ডেনমার্কের প্রধান ধর্মযাজক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ব্যঙ্গ করে এবং ইসলাম ধর্মের প্রতি নানা অপবাদ দিয়েছে। সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বলে, "মুহাম্মাদ যে ধর্ম নিয়ে এসেছে তা শুধু হত্যা ও ধ্বংসের মাধ্যমেই সম্পাদিত হয়েছে।

বেশ কিছুদিন আগে আমেরিকার এক চলচ্চিত্র নির্মাতা রাসূল সা. কে ব্যঙ্গ করে ইতিহাসের সবচেয়ে নিকৃষ্টতম চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছে। চলচ্চিত্রটির একটি দৃশ্য এমন যে, রাসূল সা. এক স্থানে বসে একটি যুবতি মেয়ে দেখে তার প্রতি আসক্ত হয়ে যান এবং তাকে বিবাহ করতে পাগল হয়ে যান (নাউযুবিল্লাহ)। অন্য এক দৃশ্যে দেখানো হয়েছে রাসূল সা. নারী নিয়ে ফূর্তি করছেন। এই চলচ্চিত্রে বড় বড় সাহাবায়ে কেরাম যেমন আবু বকর, ওমর, আলী এবং অন্যান্য সাহাবাদের নিয়ে আরো অনেক জঘন্য দৃশ্য তৈরি করা হয়েছে।(এবং সম্প্রতি ফ্রান্সের শার্লি এবদো পত্রিকা রাসূলুল্লাহ সা. কে ব্যঙ্গ করে কার্টুন ছেপেছে।) তাদের এই নিকৃষ্ট কাজের মাধ্যমে তারা শুধু রাসূল সা. ও সাহাবা রাযি. দের নিয়ে উপহাস ও ব্যঙ্গ করেনি; বরং তারা আমাদেরকেও উপহাস করেছে। তারা সকল মুসলমানকে উপহাস করেছে। তারা গোটা মানব জাতির ব্যঙ্গ ও উপহাস করেছে।

এ অপমান আমরা কিছুতেই মেনে নিতে পারি না যে, অল্প কিছু নিচু ও নিকৃষ্ট মানুষ আমাদের নবী ও আমাদের দ্বীন নিয়ে ঠাট্টা করবে। আমাদের অস্তিত্ব ও অনুভূতিতে আঘাত করবে।

হে মুহাম্মদ বিন মাসলামা ও উমায়ের বিন আলীর উত্তরসূরীরা! কী হল তোমাদের? তোমরা কি দেখছ না প্রিয় নবীকে নিয়ে ঠাট্টা করা হচ্ছে? এবং তাকে অপমান করে নোংড়া চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হচ্ছে।

হে খালিদ ও হারুনূর রশীদের সৈনিকেরা! আর কতকাল ঘুমিয়ে থাকবে? এখনো কি তোমাদের জেগে ওঠার সময় হয়নি? দেখো বেঈমানেরা আমাদের নবীকে নিয়ে ব্যঙ্গ করে কার্টুন ছাপাচ্ছে। তাঁকে গালিগালাজ করছে।

এহেন অবস্থায় আজ মুসলিম উম্মাহ কিভাবে আরামে ঘুমাতে পারে এবং বিলাসপূর্ণ জীবনযাপন করতে পারে! অথচ প্রকাশ্যে প্রিয় নবীর অবমাননা করা হচ্ছে।

কিছু মানুষের আঙ্গুল রাসূলের সম্মান নিয়ে খেলা করছে আর আনন্দ উল্লাস করছে। হে মুসলিম উম্মাহ! গাফলতের ঘুম বহু ঘুমিয়েছ, জেগে ওঠো! একজন সতর্ককারী চিৎকার করে বলছে, (ওহে জেগে ওঠ)!

এখনও কি তোমাদের নিদ্রা ভাঙ্গবে না অথচ তাদের নাপাক পত্র-পত্রিকাতে প্রকাশ্যে রাসূল সা. কে নিয়ে ব্যঙ্গ করা হচ্ছে। আজ তারা হেদায়াতের চাবিকাঠি (রাসূল সা.) কে নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপের ঘৃণাত্মক আক্রমণ করে যাচ্ছে।

আল্লাহর কসম! আল্লাহর কসম! তারা তাদের সর্বাত্মক ষড়যন্ত্র দিয়েও আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবেনা। কুকুরের অস্ত্র তো শুধু ঘেউ ঘেউ করা।

হে মহামানব! পৃথিবীর সমস্ত সাহিত্য ও অলংকারপূর্ণ ভাষা আপনার প্রশংসার হক আদায় করতে অক্ষম। হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাদের চোখের শীতলতা আমাদের অন্তরের প্রশান্তি। আপনি যা চান আমরা তাই করতে প্রস্তুত। আমরা আমাদের জীবন দিয়ে হলেও আপনার শত্রুর ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করবো। এগুলো আমাদের হৃদয়ের আকুতি। অচিরেই আপনার সৈনিকেরা তাগুতের মসনদ গুড়িয়ে দিবে। আর বিজয়ের সুশীতল হাওয়া বইবে।

শরীয়াহ কী ভয়ংকর !

-ড. ইয়াদ আল কুনাইবি

শরিয়াহ বাস্তবায়ন সম্পর্কে মানুষের শোনা কথা এবং এর ফলে অহেতুক ভয়ের কারণে তার ব্যাপারে নেতিবাচক ধারণা অনেকের মাঝে লক্ষ্য করা যায়। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, যেদিন শরীয়াহ প্রয়োগ (Enforced) করা হবে সেই ভয়ানক (!) দিনের সকালে, প্রয়োগকারীরা (Enforcers) মানুষদেরকে লাইনে দাঁড় করিয়ে উত্তপ্ত লোহার শলাকা দিয়ে খুঁচিয়ে চোখ উপড়ে ফেলবে, তাদের হাত কেটে ফেলবে এবং পশ্চাৎদেশে চাবুক মারবে।

প্রশাসনের চোখ ফাঁকি দেয়ার সকল পথ বন্ধ। এমনকি নিজ ঘরে চার দেয়ালের ভেতরেও নিরাপদ না। মনে হয় সুলতানের সৈন্যরা প্রতিটি জানালার আড়ালে লুকিয়ে আছে, দেখছে কে এক ওয়াক্ত সালাত মিস করছে আর ওমনি বাসায় ঢুকে জোর করে তওবা করাবে আর রাস্তায় টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাবে! তল্লাশির কোর্ট বসবে, যেখানে মানুষের বুক চিরে দেখা হবে গোপনভাবে সে শরিয়াহ লঙ্ঘন করেছে কি না এবং প্রয়োগকারীদের প্রতি তাদের ভালোবাসা, বিশ্বাস ও আনুগত্য আছে কি না।

যেদিন শরিয়াহ প্রয়োগ করা হবে সেদিন যেন মানুষজন গৃহের ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে জান নিয়ে পালাবে। আর নারী-শিশুরা শরিয়াহর এই প্লাবনে ভেসে যাবে।

আমার মনে হয় শরিয়ার ব্যাপারে এমনই সব আজগুবি ধারণা জনসাধারণের মাঝে প্রচারিত আছে। অথবা তারা ভাবে, আমরা শরিয়াহ বলতে বোধ হয় চেঙ্গিশ খানের শাসনের মতোই কিছু একটা চাইছি!

এমনটা যারা মনে করেন, তাদের স্পষ্ট করে বলতে চাই- আমরা যে শরিয়াহর কথা বলি তা হচ্ছে অসীম দয়ালু, পরম করুণাময়, প্রজ্ঞাময় স্বত্তার যিনি বলেছেন, ‘যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কী করে জানবেন না? তিনি সূক্ষ্মজ্ঞানী, সম্যক জ্ঞাত।’ [সূরা মূলক, আয়াত ১৪]

আমরা সেই শরিয়াহর কথাই বলি, যার কথা বলেছেন সর্বশক্তিমান আল্লাহ, যিনি আদেশ করেছেন ন্যায়বিচার, অন্যের কল্যাণ করা ও নিকটাত্মীয়দের দান করা এবং নিষেধ করেছেন ব্যাভিচার, পাপ কাজ ও নিপীড়ন} [সূরা নাহ্‌ল, আয়াত ৯০]

আমরা সেই শরিয়াহর আলোচনা করছি যা সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাঁর বান্দার সুবিধার জন্যই প্রকাশ করেছেন কারণ তিনি তাদের দূর্বলতা সম্পর্কে জানেন, তিনি বলেছেন, “আল্লাহ তোমাদের বোঝা হালকা করতে চান, কারণ মানুষকে দূর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে।” [সূরা নিসা, আয়াত ২৮]

আমরা সেই শরিয়াহর কথা বলছি যা একজন বাবাকে বলে তার সন্তানদের প্রতি দয়ালু হতে, সন্তানদের বলে তার পিতা-মাতার সাথে ভালো আচরণ করতে এবং মায়ের পায়ের তলায় পড়ে থাকতে এবং শাসককে বলে তার প্রজাদের ব্যাপারে নম্র হতে ও তাদের শাসনের পূর্বে নিজের ওপর ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে।

আমরা সেই শরিয়াহর কথা বলছি মুসলিমরা যা প্রতিষ্ঠা করতে চায় ও প্রতিষ্ঠার দাওয়াত তারা মানুষকে দেয়, কারণ এটাই তাদের উদ্দেশ্য, এবং আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার উপায়। এটা সেই শরিয়াহ যাতে উম্মাহ হবে একটি একক দেহের মত, আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার শিকল থেকে স্বাধীন যে শিকল মর্যাদা থেকে তাকে দাসে পরিণত করে এবং তার সম্মান হরণ করে।

এটা রাষ্ট্রের সেই শরিয়াহ যা একজন মুসলিমের ব্যক্তিস্বত্বাকে অন্য যেকোন রাষ্ট্রের তুলনায় অপরিসীম মর্যাদা দেয়; ইসলামি রাষ্ট্র একজন ব্যক্তির সাহায্যে এগিয়ে আসে এবং তার অধিকারের জন্য সেনাবাহিনী পাঠায়, তাঁকে বন্দীদশা থেকে উদ্ধার করে এবং তার রক্তের প্রতিশোধ নেয় যেমনটি আল্লাহর রাসূল সা. করেছিলেন মুতার যুদ্ধে সেনা সমাবেশ করে, বনু কাইনুকা’কে বিতাড়িত করার মাধ্যমে, ‘বাইয়াতে রিযওয়ান-এ তাঁর সাহাবিদের কাছ থেকে মৃত্যুর বাইয়াত নিয়ে এবং উসামাকে অভিযানের জন্য প্রস্তুতি নিতে বলে। সবকিছুই ছিল একজন মুসলিমের জন্য।

আমরা সেই শরিয়াহর কথা বলি যা দুর্বৃত্তদের বাধা দেয় মুসলিমদের তহবিল লুট করতে এবং তা সুইজারল্যান্ডে জমা করতে যখন তাদের প্রতিবেশীরা আবর্জনা থেকে খাবার খুঁজছে! এটা খাদ্য, পানীয়, চিকিৎসা, নিরাপত্তা, মর্যাদা ও শিক্ষা নিশ্চিত করবে নারী, পুরুষ, তরুণ, বৃদ্ধ, মুসলিম ও খ্রিস্টানদের জন্য এবং পাশাপাশি শরিয়াহর তত্ত্বাবধায়কদের জন্যও।

এটা সেই শরিয়াহ যার আচরণ তরুণদের প্রতি ক্ষমাশীল ও নারীদের প্রতি সম্মান; তাদের দেহকে সস্তা পণ্যের মত দোকানের জানালায় ও ম্যাগাজিনে প্রদর্শনে বাধা দেয় এবং বাধা দেয় সমাজের নারী ও পুরুষের মধ্যকার প্রতিযোগিতার অপপ্রচারকে যা দাঁড়িয়ে আছে বিশ্বাস ও সহযোগিতা, ন্যায়পরায়ণতা ও ধার্মিকতার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের ভিত্তির ওপর এবং উম্মাহর মহিমাকে অসংযত উন্মত্ততায় যেতে বাধা দেয়... এই শরিয়াহ একজন বিকৃত রুচিসম্পন্ন লেখককে থামায় যে আল্লাহর কিতাবকে উপহাস করে বা রাসূল সা. কে অপমান করে খ্যাতি পেতে চায়।

এই শরিয়াহ সমাজকে রক্ষা করে মাতালদের হাত থেকে, তাদের অপরাধ থেকে, সম্পদের ক্ষতি সাধন করা থেকে এবং অন্যদের প্রতি তাদের সীমালঙ্ঘন থেকে। এটা সেই শরিয়াহ যা হৃদয়কে সুরক্ষা দেয় এবং প্রতিভার কদর করে যাতে পৃথিবীকে গড়ে তোলা যায়, জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার সীমা অতিক্রম করা যায় এবং মানবজাতির মঙ্গল সাধন করা যায়।

এটাই শরিয়াহ! একটি পরিচ্ছন্ন পরিবেশে মানুষ বসবাস করবে, সন্তান প্রতিপালন করবে এবং সুরক্ষায় অবদান রাখবে।

এটাই শরিয়াহ যাতে রয়েছে পবিত্রতা, সতীত্ব, সম্মান, চমৎকারিত্ব, কোমলতা, নম্রতা এবং উদারতা। যদি রাসূল সা. এর সমাজ যা শরিয়াহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ছিল সর্বোচ্চ সীমায়, আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সালুল এর মত লোকের উপস্থিতি মেনে নিতে পারে যে ছিল মুনাফিকদের নেতা, যে রাসূল সা. কে কষ্ট দিয়েছিল এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল.....শরিয়াহ তাকে স্থান দিয়েছিল কারণ সে প্রকাশ্যে তার অবিশ্বাসের কথা ঘোষণা করেনি, বরং বাহ্যিকভাবে শরিয়াহর প্রতি মিথ্যা আনুগত্য দেখিয়েছিল..... আমাদের শরিয়াহ দুষ্কর্মে সহযোগী হবে না বরং তা গুনাহগার মুসলিম যাদের নাকের ধুলা ইবনে সালুলের চেয়ে উত্তম, তাদের অবস্থান কি মেনে নিবে না, গুনাহর পরিমাণ যাই হোক না কেন?

যখন শিষ্টাচারহীন, লোভী লোকগুলো যারা নিজের ন্যায্য অংশের চেয়ে বেশী কামনা করেছিল, তারা যখন রাসূল সা. কে বলল, "ন্যায় বিচার করুন হে মুহাম্মাদ! কারণ আপনি তা করছেন না" , তখন রাসূল সা. ধৈর্য্যের সাথে বলেছিলেন, "আল্লাহ মুসা আ. এর প্রতি রহম করুন, কারণ তাঁকে এর চেয়েও নিষ্ঠুর কথা বলা হয়েছিল, কিন্তু তিনি সহ্য করেছিলেন।

এই শরিয়াহর কথাই আমরা বলছি এরপরও কেউ যদি থাকে যার পরিচ্ছন্ন পরিবেশে দম আটকে আসে, যার নাক বন্ধ হয়ে যায় এবং শরিয়াহর আলোতে চোখ অন্ধ হয়ে যায়, লুত আ. এর উম্মতের মত পবিত্রতাকে যে উৎপীড়ন মনে করে কারণ ব্যাভিচার ছাড়া সে বেঁচে থাকতে পারে না যা চারজন সাক্ষীর মাধ্যমে যাচাইযোগ্য, মদ ছাড়া যে বাঁচতে পারে না যা তার মুখের দূর্গন্ধ থেকে টের পাওয়া যায়, বাঁচতে পারে না কর্মের উন্মত্ততা এবং তার পোশাকের অপবিত্রতা থেকে, বাঁচতে পারে না চুরি থেকে যদিও শরিয়াহ তার ক্ষুদাকে প্রশমিত করেছে, তাহলে তার জন্য শরিয়াহকে ভয় পাওয়া ঠিকই আছে।

গণতন্ত্র দিয়ে পাশ্চাত্যের জাগতিক উন্নতি হলেও মুসলিমদের হচ্ছে না কেন?

-আবু উমায়ের খান



﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾

অর্থঃ "কোন মু'মিন পুরুষ কিংবা মু'মিন নারীর জন্য এ অবকাশ নেই যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ফায়সালার পর নিজেরা কোন সিদ্ধান্ত দিবে। আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করবে তারা প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত হবে।" (সূরা আহযাব, আয়াত ৩৬)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে,

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾

অর্থ: "না কখনোই নয়, আপনার রবের কসম! তারা মুমিন হতে পারবে না, যে পর্যন্ত না তারা তাদের মধ্যকার বিবাদের ফায়সালা আপনার উপর অর্পণ করবে। তারপর আপনার সিদ্ধান্ত তারা নির্দ্বিধায় মেনে নিবে এবং সে ব্যাপারে নিজেদের মনে কোনরূপ দ্বিধা-সংকোচ বোধ করবে না।" (সূরা নিসা, আয়াত ৬৫)

পাশ্চাত্য জগত গণতন্ত্র দিয়ে জাগতিক কিছু ক্ষেত্রে উন্নতি করছে দেখে অনেক মুসলিম ব্যস্ত হয়ে পড়েন সেই গণতন্ত্র মুসলিম ভূখন্ডগুলোতেও আমদানী করার জন্য। আর পরাশক্তি তো রেডি হয়েই আছে তাদের রেডিমেট গণতান্ত্রিক প্রোডাক্ট মুসলিম দেশগুলোকে গেলাবার জন্য।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ৪৩ বছর পেরিয়ে গেছে। এর মধ্যে এই জাতি সামরিক শাসন, স্বৈরতান্ত্রিক শাসন, তত্ত্বাবধায়ক পদ্ধতির শাসন এবং গণতান্ত্রিক শাসন দেখেছে। সময় কাল হিসেবে গণতান্ত্রিক শাসনই বেশি সময় ধরে এই জাতি প্রত্যক্ষ করেছে এবং এখনও করছে। সময়ে সময়ে গণতন্ত্র থেকে জাতীয় নেতৃবৃন্দ বিচ্যুত হলে দাদারা আমাদেরকে নসীহত করে আবারও গণতান্ত্রিক পথে নিয়ে আসতে কসুর করেন না কখনো।

গণতান্ত্রিক জুলুম আর নিপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে জনগণ বিকল্প কিছু চিন্তা করতে গেলে সাথে সাথে দাদারা তড়িৎ শক্তি প্রয়োগ করে জাতিকে এমন বিকল্প পথ দেখান, নিপীড়ন থেকেও অধিকতর নিপীড়নের এমন দু:স্বপ্নময় পাশবিকতার সম্মুখীন করেন, যারপর অসহায় জনগণ হাত পা ছেড়ে দিয়ে "ভিক্ষা চাই না মা, কুত্তা সামলাও" বলতে বাধ্য হন। এরপর আবারও ফিরে আসে সেই চিরচেনা গণতন্ত্র এবং তার দুর্বৃত্ত রাজনীতিবিদদের সর্বময় কর্তৃত্বের অন্ধকার যুগ।



এভাবে চলতে চলতে যখন এক সময় দুর্নীতি-অপরাধ সীমা ছাড়িয়ে যায়, দাদারা তখন আমাদের রাজনীতিবিদদের আরো গণতান্ত্রিক হওয়ার পরামর্শ দেন। ফলে রাজনীতিবিদরা আরো গণতান্ত্রিক হন এবং তার সাথে তাল মিলিয়ে দুর্নীতি ও লুটপাট ও চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়তে থাকে। জনগণের দু:স্বপ্নের সেই অন্ধকার রাত আর শেষ হয় না।

শুধু বাংলাদেশ নয়, গণতান্ত্রিক ও মানবরচিত অন্যান্য শাসন পদ্ধতির দ্বারা পরিচালিত পৃথিবীর সবগুলো মুসলিম ভূখন্ডের এই একই অবস্থা। কিন্তু কেন? গণতন্ত্র দিয়ে পাশ্চাত্য জাগতিক কিছু ক্ষেত্রে উন্নতি করতে পারলেও মুসলিম দেশগুলোতে তার বিপরীত চিত্র কেন?

এই প্রশ্নের উত্তর রয়েছে একটি সহজ উদাহরণের মধ্যে। তা হলো, যে কোনো মেশিনারিজ তথা 'হার্ডওয়্যার' যন্ত্র সুচারুরূপে চালাতে হলে তার জন্য সেই সফটওয়্যারই গ্রহণ করতে হয়, যা হার্ডওয়্যার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান সরবরাহ করেছে। অর্থাৎ হার্ডওয়্যার প্রস্তুতকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তার মেশিনটি চালানোর জন্য যেই সফটওয়্যার নির্ধারণ করেছেন সেটিই তার জন্য একমাত্র উপযুক্ত। এর বাইরে অন্য যত ভালো কিছুই দেয়া হোক না কেন, তা তার জন্য উপকারী তো নয়ই; বরং ক্ষতিকারক হবে। ধরুন আপনি ইন্টারনেট মডেম কিনলেন কিউবি আর সফটওয়্যার নিলেন গ্রামীণের। এক কোম্পানীর মডেম আরেক কোম্পানীর সফটওয়্যার! এখন অবস্থাটা কী হবে তাই একবার চিন্তা করুন!

একইভাবে একটি জাতি বা সম্প্রদায়ের সামষ্টিক সফলতা ও অগ্রগতি নির্ভর করে তার আকীদা বিশ্বাসের আলোকে গৃহীত কর্মপদ্ধতি অনুযায়ী পরিচালিত হওয়ার মধ্যে। অর্থাৎ একটি জাতি তখনি উন্নতি লাভ করতে পারে, যখন তারা তাদের বিশ্বাস থেকে উৎসারিত জীবনব্যবস্থা দ্বারা পরিচালিত হবে। এ কারণেই আজকের পাশ্চাত্য ও অমুসলিম বিশ্ব যখন সেক্যুলার কুফুরী আকীদা গ্রহণ করেছে এবং সেই কুফুরী আকীদা হতে উৎসারিত মানুষের স্বার্বভৌমত্ব ও কর্তৃত্বকে সামনে নিয়ে 'জীবন তো একটাই' শ্লোগানে ভোগসর্বস্ব নীতিতে চলা আরম্ভ করেছে এবং ভোগ ও চাহিদার অবাধ যোগান ও নিশ্চিত করার জন্য গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করে সেই আলোকে পথ চলা শুরু করেছে তখন তাদের আকীদা ও জীবনব্যবস্থা পরস্পর অনুরূপ হওয়ায় তারা জাগতিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্য পাচ্ছে। আর কাফিরদেরকে জাগতিক ক্ষেত্রে উন্নতি দেয়ার কথা মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন।

অপরদিকে যারা মুসলিম। মহান আল্লাহকে রব এবং এক ইলাহ হিসেবে মেনে নিয়ে মুমিন হয়েছে। কিন্তু সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য মহান আল্লাহর দেয়া জীবনব্যবস্থা ইসলামকে বাদ দিয়ে গণতন্ত্র, রাজতন্ত্র কিংবা অন্য কোন মানব রচিত ব্যবস্থার আশ্রয় নিয়েছে, আখেরাতে তো নয়ই এমনকি এই দুনিয়াতেও তারা কোনভাবেই সফলতা লাভ করতে পারবে না। কেননা, তারা যত চেষ্টাই করুক না কেন, তাদের আকীদা বিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক ঐ সকল ব্যবস্থা তাদের সমাজ ও রাষ্ট্রে শান্তির পরিবর্তে অশান্তিই বৃদ্ধি করবে। আর পরকালের শাস্তি তো আছেই।

আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সা. কে বিশ্বাস করে মুমিন হওয়ার পর প্রতিটি মুমিনের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য হচ্ছে নিজেদের মধ্যকার যে কোন ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহকে সমাধান ও ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করা। যা উপরোক্ত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

তাই মুসলিম উম্মাহ যদি ইহকাল এবং পরকালের সার্বিক কল্যাণ চায় তাহলে তাকে দুনিয়ার এই জীবনে মহান আল্লাহর দেয়া জীবনব্যবস্থা ইসলামকেই পূর্ণাঙ্গরূপে গ্রহণ করতে হবে। আর যদি শুধু ইহকালে গণতন্ত্র ও অন্যান্য অনৈসলামিক, মানবরচিত হারাম ব্যবস্থা দ্বারা পার্থিব কল্যাণ চায় তাহলে ইসলাম ত্যাগ করতে হবে। এবার আসুন আমরা ভেবে দেখি কোন পথ গ্রহণ করবো?



আমার ঘুমন্ত জাতির নিদ্রা কবে ভাঙ্গবে?

-হাসান আব্দুল বারী



রাসূল স. এর সময়ের কথা। একজন মুসলিম নারী সাহাবী কিছু জিনিষপত্র নিয়ে ইহুদি গোত্র বনী কায়নুকার বাজারে গেলেন। জিনিষপত্র বিক্রি করে কোন প্রয়োজনে এক স্বর্ণকারের দোকানে গিয়ে বসলেন। বদমাশ ইহুদিদের মনে শয়তানী উথলে উঠলো। তারা এই মহিয়সী নারীর নেকাবাবৃত চেহারা নেকাবহীন করার ফন্দি আটলো; কিন্তু তিনি তাদের নাপাক খাহেশ প্রত্যাখ্যান করলেন। দুশ্চরিত্র এক ইহুদি সাহাবিয়ার কাপড়ের নীচের অংশের আঁচল পিছন দিক থেকে বেঁধে দিল। তিনি বদমাশটার এ শয়তানী টের পাননি। ফলে বসা থেকে উঠতেই তাঁর শরীর থেকে কাপড় সরে যায়। আর অদূরে দাঁড়িয়ে ইহুদি শয়তানগুলো হাঁসিতে ফেটে পড়ে। বাজারে আগত একজন মুসলমান এ কাণ্ড দেখতে পেলেন। আত্মমর্যাদা ও দীনি চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি সে পিশাচ ইহুদীটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং তার ইহলীলা সাঙ্গ করে দিলেন।

তখন সেখানে উপস্থিত ইহুদিরা সে মুসলমানকে শহীদ করে দিল। এ ঘটনা রাসূল স. এর কাছে পৌছলে তিনি এতটাই রাগান্বিত হলেন যে, তাৎক্ষণিকভাবে বনী কাইনুকার বিরুদ্ধে অভিযানের ফরমান জারী করে দেন। দয়া ও সহনশীলতার আঁধারস্বরূপ যার আবির্ভাব; ইহুদিদের এ ঘৃণ্য ও নগ্ন পদক্ষেপ তাঁর মাঝেও ক্রোধের অগ্নি প্রজ্জলিত করেছে। আর তাইতো স্বয়ং রাসূল সা. মদিনার প্রশাসনিক ভার হযরত আবু লুবাবা রাযি. এর কাঁধে অর্পণ করে মুসলিম সৈন্য বাহিনী সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে বনী কাইনুকা অভিমুখে মার্চ করেন। সায়্যেদুশ শুহাদা হামযা রাযি. এর হাতে অর্পণ করা হয় ইসলামের ঝাণ্ডা। বনী কাইনুকার ইহুদিরা মুসলিম বাহিনীকে ধেঁয়ে আসতে দেখে তাদের দুর্গের ফটক বন্ধ করে দেয়। রাসূল সা. কেল্লা অবরোধের নির্দেশ দেন। দীর্ঘ দুই মাস স্থায়ী হয় এ অবরোধ। মুসলমানদের ভাব গতি দেখে ভীরু ইহুদিদের মনে ভয় ঢুকে যায়। তাই তারা সিদ্ধান্ত নেয় আত্মসমর্পণের। মুসলমানরা তাদের সবাইকে বন্দী করে ফেলে। এ অবস্থা দেখে ইহুদিদের মাস্তুত ভাই মুনাফেক সর্দার আব্দুল্লাহ বিন উবাই তাদের বাঁচানোর জন্য বাহানার আশ্রয় নেয়। সে বুঝে ফেলে যে, রাসূল সা. তাদের পুরুষ সদস্যদের হত্যা করবেন। তাই সে রাসূল সা. এর পায়ে পড়ে কান্নার ভান করে। আর বলতে থাকে, মুহাম্মাদ! এরা আমার সাথে সন্ধিবদ্ধ। তাই এদের প্রতি সদয় হোন। এদের মারবেন না। রাসূল সা. তার কথায় কর্ণপাত না করায় পুনরায় এ গাদ্দার আবেদন করতে থাকে। এবার রাসূল সা. মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে নেন। সে রাসূল সা. এর বাহু ধরে অনুনয়-বিনয় করতে থাকে। এতে রাসূল সা. রাগান্বিত হয়ে বলেন, আমার সামনে থেকে সরে যাও বলছি। রাসূল সা. তখন এতটাই রাগান্বিত ছিলেন যে, উপস্থিত সকলে তাঁর চেহারা রক্তিমবর্ণ ধারণ করতে দেখেছে। রাসূল সা. পুনরায় তাকে বললেন, তোমার ধ্বংস হোক! ছাড় বলছি। কিন্তু মুনাফেক উবাই নাছোড় বান্দা। সে হাতজোড় করে বলতে থাকে- যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনি আমার মিত্রদের ব্যাপারে নরম হচ্ছেন ততক্ষণ পর্যন্ত আমি সরবো না। চারশত নিরস্ত্র পুরুষ আর তিনশত সশস্ত্র মানুষকে আপনি একসাথে মেরে ফেলতে চান? তারা তো আমাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছে। আমার মনে হয় এদের পরবর্তী প্রজন্ম এর প্রতিশোধ নিবে। তার পীড়াপীড়ির কারণে অবশেষে রাসূল সা. ইহুদিদের সাথে নরম আচরণ করেন। তাদের ধন-সম্পদ বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করে তাদেরকে মদিনা থেকে বিতাড়িত করে দেন। -সীরাতে ইবনে হিশাম

প্রিয় মুসলিম উম্মাহ! সীরাতে নবী সা. এর এ ঘটনার দিকে একটু নজর দিন। ইহুদিরা প্রতিনিয়তই অনেক অপরাধকর্ম করছিল, যার ফলে তারা এমনিতেই শাস্তির উপযুক্ত ছিল। রাসূল সা. তাদের ছাড় দিয়েছেন; কিন্তু তাদের একটি অপরাধ একজন মুসলিম নারীর ইজ্জত আব্রুর প্রতি হস্ত প্রসারণ রাসূল সা. সহ্য করলেন না। এলাকা থেকে বিতাড়িত করেই তবে ক্ষান্ত হলেন। হ্যাঁ, রাসূল সা. এর কাছে নিজের একজন উম্মতের মান-সম্মান এতই মূল্যবান ছিল। আর এ জন্যই পুরো বাহিনীকে যুদ্ধের জন্য পাঠালেন। যারা অপরাধে সরাসরি সম্পৃক্ত শুধু তাদের নয়; বরং পুরো গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা করলেন। নিজেও নেমে পড়লেন রণসাজে যুদ্ধের ময়দানে। মাত্র একজন মুসলমানের জন্য সাতশত ইহুদিকে হত্যার সংকল্প করলেন। অসংখ্য অফুরন্ত দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর ওপর। এতো গেল নবীযুগের ঘটনা। এবার ইতিহাসের আরেকটি ঘটনার দিকে লক্ষ্য করুন। এটি হল আমুরিয়া শহরে রোমীয়দের হাতে বন্দীনি এক নিপীড়িত অসহায় মুসলিম নারীর ইতিহাস কাঁপানো ঘটনা। ২২৩ হিজরীর কোন এক বিকেলে জেলখানার প্রকোষ্ঠে এক রোমীয় সৈন্য কর্তৃক লাঞ্ছনার শিকার হন তিনি। অসহায় নারীটি সে অবস্থায় খলীফা মু'তাসিমকে চিৎকার দিয়ে ডাকতে থাকে ওয়া মু'তসিমাহ...! মু'তাসিম বাঁচাও.. বাঁচাও..। এ আহ্বান যখন মু'তাসিমের কাছে পৌঁছল তখন তিনি কী করলেন? তখন তিনি যা করেছেন তা ইতিহাসের সোনালী পাতায় জ্বলজ্বল করে লিখা আছে। লাব্বাইক, লাব্বাইক বলে প্রাসাদের ভিতরেই জ্বালাময়ী ভাষণ দিলেন। তাৎক্ষণিকভাবে যুদ্ধের ঘোষণা জারী করে রণপ্রস্তুতির নির্দেশ দিলেন। খলিফা মু'তাসিম এতটাই উত্তেজিত হলেন যে, অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত বিশাল এক বাহিনী প্রস্তুত করে ফেললেন, যা ইতিপূর্বে করতে দেখা যায়নি তাকে। গন্তব্য আমুরিয়া- যা ছিল খ্রিষ্টানবিশ্বের হৃদপিণ্ড। কনস্টানটিনোপলের চেয়েও বেশী অহংকারের। ইতিপূর্বে কোন মুসলিমই যার দিকে হাত বাড়ায়নি। খলিফা মু'তাসিম এক মুসলিম নারীর আব্রু রক্ষার্থে দুর্ভেদ্য আমুরিয়ায় অভিযান পরিচালনা করেন। অতঃপর অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই আমুরিয়া বিজয় করে ফেলেন। অতঃপর সেখানের নির্যাতিত মুসলমানদের সুরক্ষার বন্দোবস্ত করেন। (আল কামেল; ইবনুল আসীর) দেখুন, এ হল মুসলমানদের স্বর্ণালী ইতিহাস। একজন নারীর আর্তনাদ যেখানে খলিফার বিবেককে কাঁপন ধরিয়ে দেয়। হাজার মাইল ব্যবধান তাঁর কাছে তুচ্ছ করে দেয়। অতঃপর সকল বাঁধার প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে একের পর এক জনপদ বিরান করে শত্রুর দুর্ভেদ্য শহর উলট-পালট করে তাকে উদ্ধার করতে প্ররোচিত করে। হ্যাঁ, একজন মুসলমানের ইজ্জতের মূল্য এতখানিই। এবার একটু বর্তমান বিশ্বের দিকে তাকান! উসওয়ায়ে নবী, পূর্ববর্তীগণের জীবনাদর্শের সাথে মুসলিম উম্মাহর অবস্থা এবং আপনার আমার ভূমিকা মিলিয়ে দেখা যাক। কোন ধরণের বাহানায় না গিয়ে যদি নিরপেক্ষভাবে ভাবা হয়, তাহলে মনে হয় বাঁচার কোন সুযোগ খুঁজে পাওয়া যাবে না। এক্ষেত্রে আমাদের ভূমিকা সম্পূর্ণ উল্টো ও ত্রুটিপূর্ণ! আত্মপ্রবঞ্চনার আশ্রয় না নিয়ে নিজের হৃদয়ের আকুতি শুনুন। দেখবেন তা আমাদের এ কাপুরুষোচিত ভূমিকার ধিক্কারই জানাচ্ছে, সাধুবাদ নয়। হৃদয়ের স্পন্দন বোঝার চেষ্টা করুন। সে আমাদের এ নীরবতায় গালে চপেটাঘাতই করছে। আজ উম্মাহর কত শত কন্যার সম্ভ্রম ইহুদি-নাসারাদের বিনোদন ও ভোগ্যপণ্যে পরিণত হচ্ছে। উম্মাহর আত্মমর্যাদাসম্পন্ন কন্যা ড. আফিয়া সিদ্দিকীকে আমাদের চোখের সামনে আমেরিকার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। দীর্ঘ দশ বছর হয়েছে, আমরা কী করেছি তাকে উদ্ধারের জন্য?



কোন আলেমগণ নবীদের পথে রয়েছেন তা বুঝবো কীভাবে?

-আবু হামজা

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে কুরআনুল কারীমে বলেছেন, 'তোমরা যদি না জানো তবে আহ্‌লুয যিক্‌র বা জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা করো।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, **'আল উলামা-উ ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া'** বা আলেমগণ হলেন নবীদের উত্তরাধিকারী। অতএব আলেমদের কথা শুনা এবং মানার ব্যাপারে ইসলামের নির্দেশনা অত্যন্ত স্পষ্ট; এখানে জটিলতার কিছু নেই, আলোচনারও কিছু নেই।

সত্যপন্থি আলেমদের কথা শোনা এবং মানা সাধারণ মানুষদের ওপর অবশ্য কর্তব্য। আলেমদের আনুগত্য ত্যাগ করে জাহেলরা যদি কুরআন হাদিসের শুধু বাংলা অনুবাদ পড়ে ব্যাখ্যা করা ও ফতোয়া দেওয়া আরম্ভ করে তাহলে পথভ্রষ্ট হওয়া ছাড়া কোনো গতি নেই।

অতএব আমার এই লেখা থেকে যদি কেউ এমন কোনো সিদ্ধান্ত নিতে চেষ্টা করেন যে, আমি আলেমদের মর্যাদার অবমাননা করেছি তাহলে সেটা সেই পাঠকের ভুল ধারণা; আমার নয়।

আমার আলোচনার বিষয় হলো, কোনো আলেম সত্যপন্থী কি না তা আমরা কিভাবে বুঝবো তা নিয়ে সামান্য কিছু কথা বলা। কারণ অনেক সময় দেখা যায়, নিছক সার্টিফিকেট আর জ্ঞানের বহর দেখে আনুগত্যের নামে অনেকের পূজা আরম্ভ করা হয় এবং বলা হয় যে, তারা যা বলবে সেটাই সত্য। সাধারণ মানুষ তাদের বক্তব্য যাচাই বাছাই করার কোনো অধিকার রাখে না।

এর স্বপক্ষে যুক্তি হিসেবে অনেকে বলেন যে, সাধারণ মানুষ তো সাধারণ মানুষই, যদি যাচাই করার ক্ষমতাই তাদের থাকতো তাহলে তো তাদের আর আলিমের কাছে যাওয়ারই কোনো দরকার হতো না। কোনো ব্যাপারে কোনো কোনো আলেমদের মতামত গ্রহণ না করা হলে সাধারণদেরকে অপবাদ দেওয়া হয় যে, আলিমের কথা তাদের মনমতো না হওয়ার কারণে তারা মানছে না। বাস্তবে আলিমের কথা মনমতো না হওয়ার কারণে তারা মানছে না, নাকি কুরআন সুন্নাহ ও আলেমদের কথার সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ার কারণে মানছে না ? তা বস্তুনিষ্ঠভাবে যাচাই করা হয় না।

আলেম সাহেবের কথা সে আলেম হওয়ার কারণেই সব সত্য, আর সাধারণ মানুষের কথাকে নিছক সে সাধারণ মানুষ হওয়ার কারণেই পরিত্যাজ্য মনে করা হয়। হ্যাঁ, কেউ যদি সত্যি আলেমদের কথা শুধু নিজের মনমতো না হওয়ার কারণেই তা বর্জন করে তাহলে সে যে নিশ্চয়ই মতলববাজ একথা মেনে নিতে আমি মোটেই কুণ্ঠাবোধ করি না।

প্রশ্ন হলো, **is the truth justified by the man or the man is justified by the truth?** যদি নিছক আলেম হওয়ার কারণে কাউকে এই সার্টিফিকেট দেওয়া হয় যে সে যা বলবে সেটাই সত্য, তাহলে আল্লাহ তাআলা নিম্নোক্ত দুটি আয়াতে যা বলেছেন তার প্রয়োগ কোন শ্রেণীর ওপর হবে?

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاعِنُونَ ﴾

১. নিশ্চয়ই যারা গোপন করে সু-স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ ও হেদায়াত যা আমি নাযিল করেছি, মানুষের জন্য তা সুস্পষ্টভাবে কিতাবে বর্ণনা করে দেয়ার পরও। তাদেরকে আল্লাহ তাআলা লা'নত করেন এবং লা'নতকারীগণও তাদেরকে লা'নত করে। (সূরা বাকারা, আয়াত ১৫৯)

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلا النَّارَ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾

২. নিশ্চয়ই যারা গোপন করে যে কিতাব আল্লাহ নাযিল করেছেন এবং এর বিনিময়ে সামান্য মূল্য গ্রহণ করে, তারা শুধু আগুনই তাদের উদরে পুরে। আর আল্লাহ কিয়ামতের দিনে তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদেরকে পরিশুদ্ধও করবেন না। আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (সূরা বাকারা, আয়াত ১৭৪)

মানুষকে আল্লাহর কালাম শিখানো যেমন সাধারণ মানুষের দায়িত্ব নয় তেমনি আল্লাহর আয়াত গোপন করাও সাধারণ মানুষের কাজ নয়। নবীদের পর যুগে যুগে আল্লাহর বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্যাপারে আলেমদের ভুমিকা যেমন অনস্বীকার্য তেমনই একথাও সত্য যে, আল্লাহর কালামের বিকৃতি, অপব্যাখ্যা ও তা গোপন করার নিকৃষ্ট কাজটাও এই আলেমদের একটি শ্রেণীই করেছে। ইহুদী জাতির আলেমদের কথা এ ব্যাপারে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আর আল্লাহর রাসূল সা. এর হাদীস অনুযায়ী ইহুদীরা যতো ধরনের অপকর্ম করতো এই উম্মতের মধ্যেও সেসব অপকর্মের প্রাদুর্ভাব ঘটবে। অতএব এই উম্মতের মধ্যেও একদল আলেম থাকবে যারা আল্লাহর কালাম গোপন করা এবং তাঁর বিকৃত অর্থ করার নিকৃষ্টতম কুকর্মে লিপ্ত থাকবে।

একই সাথে হকপন্থী আলেমগণও থাকবেন যারা আপোষহীনভাবে আল্লাহর দ্বীনের প্রচার প্রসার ও প্রতিষ্ঠার মহান কাজে নিয়োজিত থাকবেন।

আমাদের মাঝে এই হকপন্থী এবং বাতিলপন্থী উভয় শ্রেণীর আলেমই যেহেতু থাকবে তাই সাধারণ মানুষের পক্ষে কোনো যাচাই বাছাই ছাড়া শুধু আলেম হওয়ার কারণেই কি কারও অন্ধ আনুগত্য করাটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে?

প্রশ্ন হলো, এই উভয় শ্রেণীর মধ্য থেকে হকপন্থীদেরকে চেনার উপায় কী? এখানে আমি নবীদের ইলমের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে কারা সত্যিকার অর্থে নবীদের পথে রয়েছেন? কাদের অবস্থা নবীদের অবস্থার সাথে বেশী মিলে? সে সম্পর্কে ভিন্ন আঙ্গিকে কিছু কথা বলবো।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ প্রসঙ্গে বলেন, 'আশাদ্দুল বালা-ই বিল আম্বিয়া, ফাল আমসাল ফাল আমসাল' অর্থাৎ সবচেয়ে বেশী কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখী হন নবীগণ, তারপর যারা তাদের পথের যতো নিকটতম তাদের ওপর ততো বেশী বিপদ আপদ আপতিত হয়।

একথা প্রমাণের জন্য নিশ্চয়ই আর কোনো দলীল দিতে হবে না যে যারা নবীদের পথের ওপর যতো বেশী থাকবেন তাদের অবস্থা নবীদের অবস্থার সাথে ততো বেশী মিলে যাবে।

আল্লাহর বাণী প্রচার করতে গিয়ে যুগে যুগে নবীদেরকে যে যুলুম নির্যাতন ও প্রতিকুল পরিস্থিতির শিকার হতে হয়েছে তাদের অনেকের বিস্তারিত ঘটনা আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বর্ণনা করেছেন। তাই তার কোনো বিস্তারিত বর্ণনার প্রয়োজন নেই। আমি শুধু এমন একটি আয়াত তুলে ধরবো যা তাদের সকলের অবস্থার একটি ছবি এঁকে দিবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴾

অর্থ: 'তোমরা কি মনে করেছো তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে অথচ তোমাদের ওপর সেই ধরণের বিপদ আপদ আসবে না যে ধরণের বিপদ তোমাদের পূর্বেকার লোকদের ওপর এসেছিলো? দুঃখ কষ্ট, বিপদ আপদ তাদের ওপর আপতিত হয়েছিলো, তারা এমন প্রকম্পিত হয়ে উঠেছিলো যে রাসূল সা. ও তাঁর সাথীগণ বলে উঠলেন, 'আল্লাহর সাহায্য আর কখন আসবে? জেনে রাখ আল্লাহর সাহায্য অতি নিকটে' (সূরা বাকারা, আয়াত ২১৪)

যুগে যুগে যতো নবী রাসূলদেরকে আল্লাহ তাআলা প্রেরণ করেছেন তাদের দাওয়াতের সারমর্ম যে ছিলো তাগুতের উৎখাত ও আল্লাহর তাওহীদ প্রতিষ্ঠা, তা সূরা নাহলের ৩৬ নং আয়াতে তুলে ধরা হয়েছে। তাই অনিবার্যভাবে প্রায় সকল নবীকেই সমকালীন তাগুতদের বিরুদ্ধে লড়াই সংগ্রাম করতে হয়েছে।

কোনো নবী রাসূলগণই নিছক কিছু মানুষের ব্যক্তিগত আমল সংশোধনের মধ্যে তাদের কাজকে সীমাবদ্ধ রাখেননি। তারা সকলেই ব্যক্তির আকীদা ও আমল আখলাকের যে সংশোধন দিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন তাঁর চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিলো গোটা সমাজকে সংশোধন করা। সমাজ থেকে সকল ধরণের তাগুতের উৎখাত ও আল্লাহর তাওহীদ প্রতিষ্ঠা।

আখেরী নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর যেহেতু আর কোনো নবী আসবেন না তাই কেয়ামত পর্যন্ত সকল মিথ্যার বিরুদ্ধে সত্যের এ লড়াই চালিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব এই উম্মতের ওপর তথা নবীর জ্ঞানের উত্তরাধিকারী আলেমদের ওপর। তাই আল্লাহর তাআলার স্বাভাবিক নীতি অনুযায়ী উম্মতে মুহাম্মদীর নেতৃবর্গ ও আলেমগণের সাথে সমকালীন তাগুতের সংঘাত অনিবার্য, যদি তারা তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকে। বাস্তবতাও যে এমনই, তাঁর সাক্ষী আমাদের ১৪০০ বছরের ইতিহাস।

আমরা জানি অতীতে যুগে যুগে আল্লাহর কতো নবীকে কতো নির্মম নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে।

আমরা জানি কতো লোককে লোহার চিরুনি দিয়ে গোস্ত থেকে হাড্ডি আলাদা করা হয়েছে।

আমরা জানি আসহাবুল উখদুদের ঘটনায় কি নির্মমতার শিকার হয়েছিলেন ঈমানদাররা।

আমরা জানি নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি পরিস্থিতির শিকার হয়েছিলেন।

আমরা জানি সাহাবায়ে কেরামের ওপর কেমন কঠিন বিপদ আপতিত হয়েছিলো।

আমরা জানি হুসাইন রাযি. কে কেন নির্মমভাবে শাহাদাতের পেয়ালা পান করতে হয়েছে।

আমরা জানি ইমাম আবু হানীফা রহ. কে কিভাবে কারাগারের অন্ধপ্রকোষ্ঠে জীবন দিতে হয়েছে।

আমরা জানি ইমাম মালেক রহ. এর ওপর কী অত্যাচার করা হয়েছিলো।

আমরা জানি কী ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে পড়েছিলেন ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহ.।

আমরা জানি ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. কে কতো যুলুম অত্যাচার সইতে হয়েছে।

আমরা জানি কিভাবে বালাকোটের ময়দানে জীবন দিতে হয়েছিলো ইসমাঈল শহীদ রহ. কে।

আমরা জানি কিভাবে হাসান আল বান্না, সাইয়েদ কুতুবদেরকে হত্যা করা হয়েছে।

আমরা জানি কিভাবে লাল মসজিদে শহীদ করা হয়েছিলো আব্দুর রশীদ গাজী রহ. কে।

আমরা দেখেছি কিভাবে আনোয়ার আল আওলাকী রহ কে হারামাইনের খাদেমদের দেশ থেকে উড়ে যাওয়া ড্রোন্ আঘাত হেনেছে।

আমরা দেখছি কিভাবে Either with us or against us থিওরি অনুযায়ী পৃথিবী দুভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে।

অতীতের যেকোন সময়ের চেয়ে বর্তমান যুগে কুফফাররা তাদের নানা কুটিল চক্রান্তের জালে গোটা পৃথিবীকে অনেক বেশি আবদ্ধ করে ফেলেছে। এর প্রভাবে এখন আপনি মুসলিম উম্মাহ্‌র মধ্যে বেশ ক'য়েক ধরণের আলেম দেখতে পাবেন। যেমন:

১. আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা, মুসলিম ও মানবজাতিকে যালেমদের হাত থেকে রক্ষাকল্পে জিহাদে নিয়োজিত আলেমশ্রেণী। ঘর-বাড়ি, স্ত্রী-পুত্র, ধন-সম্পদ ও আরাম-আয়েশ সব কিছু এদেরকে ত্যাগ করতে হয়েছে। এদেরকে খুঁজে খুঁজে হত্যা করা হয়, এদের ওপর ড্রোন হামলার লক্ষ্যবস্তু বানানো হয়।

২. তাদের সমর্থনকারী, যারা প্রত্যক্ষ ময়দানে এখনও যোগদান করেননি। এরা নিজ ভূমিতেও পরবাসীর মতো আছেন। যখন তখন বিশ্ব তাগুতদের স্থানীয় এজেন্টরা এদেরকে তুলে নিয়ে যায়, যুলুম নির্যাতন করে, জেলে আটকে রাখে, গুম করা হয়, হত্যা করা হয় ইত্যাদি।

৩. রিস্ক-ফ্রি দাওয়াতের কাজ, ব্যক্তিগত আমল ও গভীর জ্ঞান চর্চায় নিয়োজিত। এরা তাবীজ-কবজ, পীর পূজা, মাজার পূজা ইত্যাদি নানা বিষয়ে মানুষকে সচেতন করেন; তবে পারতপক্ষে এরা এমন কিছু বলেন না, যাতে তাগুতদের সাথে তাদের কোনো সংঘর্ষ বাঁধে।

৪. আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আলেমদের একাংশ; জিহাদসহ নানা বিষয়ে যাদের বক্তব্য বুশ-ফাহাদ গংদের সাথে মিলে যায়। যারা আন্তর্জাতিক মিডিয়াতে বেশ সরব, যাদের সভা সেমিনারে স্বয়ং কুফফাররা নিরাপত্তা প্রদান করে থাকে। আরাম আয়েশ কিছু ত্যাগের তো প্রয়োজনই হয় না, বরং ইসলাম তাদের জন্য অন্যরকম এক সেলিব্রিটি হওয়ার সুযোগ এনে দিয়েছে।

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকদের মধ্যে থাকা আলেমগণ অনেকের কাছে মোটেই বড় আলেম নন; কারণ, ফাহাদ গংদের ইউনিভার্সিটি থেকে তাদের অনেকে বড় কোনো ডিগ্রি নেননি; নিলেও সেখানে শিক্ষকতার 'সৌভাগ্য' লাভ করেননি, করলেও তারা আসলে 'উল্লেখযোগ্য' কেউ নন, উল্লেখযোগ্য হলেও তারা রাষ্ট্রীয় 'সুনজর' থেকে বঞ্চিত।

'বড় আলেম' হওয়ার আধুনিক থিওরীতে তারা উত্তীর্ণ নন বিধায় তারা রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা পান না, তাদেরকে নিয়মিত স্যুট-কোট পরে টেলিভিশনে হাজিরা দিতে দেখা যায় না। কুফফারদের ভাষায় তারা মুজাহিদীনদেরকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করতে পারেন না, জিহাদকে তারা 'স্ট্রাগল এন্ড স্ট্রাইভ' বলতে পারেন না ইত্যাদি আরও কতো দোষ তাদের, তার কোনো অন্ত নেই।

তৃতীয়ও চতুর্থ শ্রেণীর বিগ শট আলেমদেরকে আমরা দেখতে পাই সার্টিফিকেট আর জ্ঞানের ভারে তারা ন্যুজ হয়ে পড়েছেন, সার্টিফিকেটের ওজন তাদের কোমর ভেঙে দিচ্ছে; কুরআন হাদিস বুঝার ক্ষেত্রে ব্যকারণিক মারপ্যাচের জটিলতাই কাটিয়ে উঠতে পারছেন না, উম্মাহর ব্যাপারে ভাবার সময় কোথায় তাদের!

আমাদের একদল ভাই রয়েছেন যারা ৩য় ও চতুর্থ শ্রেণীর আলেমদের কথা ছাড়া আবার কিছুই বিশ্বাস করতে পারেন না।

ফিলিস্তিনে মুসলিম নিধন চললে কী হবে, ইরাকে লাখ লাখ মুসলিম শিশু মারা গেলে কী হবে, আফগানে বৃষ্টির মতো বোম্বিং হলে কী হবে, সোমালিয়াতে হত্যাযজ্ঞ চললে কী হবে, ইয়েমেনে ড্রোন অ্যাটাক হলে কী হবে, মিশরে পাখির মতো নির্বিচার হত্যাকান্ড চললে কী হবে 'এই আলেমরা' তো কিছু বলছেন না!!! অতএব নিশ্চয়ই এই হত্যাযজ্ঞের বৈধতার, কিংবা অন্তত মুখে কুলুপ এটে থাকার ব্যাপারে কোনো না কোনো ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই আছে!!

হ্যাঁ, আমরা স্বীকার করি অনেক বিষয়ই এমন রয়েছে যা বোঝা সাধারণ মানুষের পক্ষে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতদের সহায়তা ছাড়া সম্ভব নয়। তাই বলে কি দিক নির্ণয়ের জন্য সব সময় ভুগোল বিশারদ হওয়া প্রয়োজন?

কখন ও কিভাবে মানুষ দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করবে?

বহু আগ থেকে ভাবতাম কিভাবে পথহারা মানুষ সঠিক পথের সন্ধান পাবে? এবং দীনহারা মানুষ দলে দলে দীনে ইসলামে প্রবেশ করবে? মনে মনে ভাবতাম হয়তো দাওয়াতের মাধ্যমেই মানুষ ইসলাম ধর্মে দলে দলে প্রবেশ করবে।

এই দাওয়াতী পদ্ধতি হতে পারে লেখালেখির মাধ্যমে, হতে পারে বয়ান বক্তৃতার মাধ্যমে, আবার হতে পারে তা প্রচলিত দাওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমে, আরও অনেক পদ্ধতিতে। আর এগুলো ছিল একান্তই আমার মনের ভাবনা।

কিন্তু আমি ভাবিনি যে, এর সঠিক পদ্ধতি আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারীমে বলে দিয়েছেন। যখন আমি কুরআন পড়তে শুরু করলাম তখন ধীরে ধীরে বুঝতে পারলাম যে, এ বিষয় নিয়ে আমাকে ভাবতে হবেনা; বরং আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারীমে যে পদ্ধতি বলে দিয়েছেন আমাকে শুধু তার ওপর আমল করলেই চলবে। যেহেতু আল্লাহ তাআলা ইসলামকে দীন হিসাবে মনোনীত করেছেন, সুতরাং তিনিই ভাল জানেন কিভাবে মানুষ দলে দলে দীনে ইসলামে প্রবেশ করবে।

কিন্তু সেই পদ্ধতি কী, এবং সে সময় কখন, যখন মানুষ দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করবে?

আল্লাহ তাআলার ভাষায় শুনুন, কিভাবে ও কখন মানুষ দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করবে? আল্লাহ তাআলা বলেন ,

﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (1) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا (2)﴾

অর্থ: “যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে তুমি লোকদেরকে দলে দলে আল্লাহর দীনে প্রবেশ করতে দেখবে।” (সূরা নাস্‌র, আয়াত ১-২)

সুতরাং এ আয়াত থেকে আমরা জানতে পারলাম যে, যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে, তখন মানুষ দলে দলে আল্লাহর দীন অর্থাৎ ইসলামে প্রবেশ করবে।

কিন্তু এখন প্রশ্ন হল আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় কখন আসবে? এ প্রশ্নের উত্তরও আল্লাহ তাআলা সূরাতুল কিতালের (মুহাম্মাদ) ৭ নং আয়াতে দিয়ে দিয়েছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾

অর্থ: “হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি আল্লাহকে সাহায্য কর তাহলে তিনিও তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পা (অবস্থান) সুদৃঢ় করবেন।” (সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত ৭)

এ আয়াত থেকে আমরা জানতে পারি, আল্লাহ তাআলার সাহায্য ও বিজয় আসবে না, যতক্ষণ না আমরা আল্লাহকে সাহায্য করি।

কিন্তু এখন প্রশ্ন হল, আমরা আল্লাহকে কিভাবে সাহায্য করবো? অথচ আমরা তো ছোট তিনি অনেক বড়, আমরা দুর্বল তিনি শক্তিশালী, আমরা তুচ্ছ তিনি মহান, আমরা হীন, লাঞ্ছিত তিনি সম্মানিত, মর্যাদাবান।

সবচেয়ে বড় কথা হল আমরা তার সৃষ্ট মাখলুক আর তিনি মহান স্রষ্টা, সব কিছুই তিনি সৃষ্টি করেছেন। তাহলে আমরা কিভাবে তাকে সাহায্য করবো?

এ প্রশ্নের উত্তরও আল্লাহ তাআলা সুরাতুল হাদীদের ২৫ নং আয়াতে দিচ্ছেন, তিনি বলেন.

﴿وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ﴾

অর্থ: “আমি লোহা নাযিল করেছি যার মধ্যে রয়েছে (যুদ্ধের জন্য সহায়ক) প্রচণ্ড শক্তি ও মানুষের জন্য অনেক কল্যাণ। যাতে আল্লাহ তাআলা জানতে (পরীক্ষা করতে) পারেন যে, কে না দেখে তাঁকে ও তাঁর রাসূলদেরকে সাহায্য করে।” (সূরা হাদীদ, আয়াত ২৫)

আল্লামা ইবনে কাছীর রহ. বলেন,

وَقَوْلُهُ: {وَأَنزلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ} أَيْ: وَجَعَلْنَا الْحَدِيدَ رَادِعًا لِمَنْ أَبَى الْحَقَّ وَعَانَدَهُ بَعْدَ قِيَامِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِ؛

অর্থাৎ আমি লোহাকে বানিয়েছি প্রতিরোধক ঐ সকল লোকদের জন্য যাদের সামনে হক স্পষ্ট হওয়ার পরও তারা তা অস্বীকার করে এবং অবাধ্য হয়ে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে।

হযরত ইবনে ওমর রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ حَتَّى يُعْبَدَ اللهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي، وَجُعِلَ الذِّلَّةُ، وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ .

অর্থ: “আমাকে কিয়ামতের পূর্বে তরবারি দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে যাতে করে এক আল্লাহর ইবাদত করা হয় এবং তিনি আমার রিজিক আমার তরবারির নীচে রেখেছেন এবং ঐ ব্যক্তি লাঞ্ছিত ও অপদস্ত হবে, যে আমার আদেশ অমান্য করবে। আর যে ব্যক্তি কোন কওমের সাদৃশ্য গ্রহণ করবে, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (মুসনাদে আহমাদ)

আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী রহ. বলেন,

{ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرهُ} بِأَنْ يَنْصُر دِينه بِآلَاتِ الْحَرْب مِنْ الْحَدِيد وَغَيْره

“আল্লাহ তাআলা জানতে চান যে, কে তার দীনকে সাহায্য করবে লোহা এবং অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্রের মাধ্যমে।” (তাফসীরে জালালাইন)

সুতরাং আমরা জানলাম যে, মানুষ আল্লাহর দীনে প্রবেশ করবে না, তবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসার পর এবং আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে না যতক্ষণ না আমরা আল্লাহকে সাহায্য করি।

আর মানুষ কর্তৃক আল্লাহকে সাহায্য করার পদ্ধতি হল যুদ্ধাস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ (জিহাদ) করা। সুতরাং যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে তখন দলে দলে মানুষ দ্বীনে ইসলামে প্রবেশ করবে।

সাইয়্যিদ কুতুব ও জেলখানার ইমাম

-ইবনে আব্দুর রহমান



মিশরের অবিসংবাদিত ইসলামিক ব্যক্তিত্ব আল্লামা সাইয়্যিদ কুতুব রহ. কে 'কালিমা তাইয়্যিবার ব্যাখ্যা লেখা ও ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি ও করণীয়' শীর্ষক একটি কিতাব লিখার কারণে তৎকালীন মিসরের স্বৈরশাসক তাকে ফাঁসি দিয়ে শহীদ করেছিলো। ফাঁসির আগের রাতে সাইয়্যিদ কুতুব রহ. কে কালিমা পড়ানোর জন্য জেলের ইমামকে পাঠানো হলো। জেলের ইমাম আল্লামা সাইয়্যিদ কুতুব রহ. কে কালিমার তালকিন দেয়ার জন্য এলে। তাকে দেখে সাইয়্যিদ কুতুব রহ. জিজ্ঞাসা করলেন,

আপনি কি জন্য এখানে এসেছেন?

ইমাম বললেন, আমি আপনাকে কালিমা পড়াতে এসেছি। মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার আগে আসামীকে কালিমা পড়ানো আমার দায়িত্ব।

সাইয়্যিদ কুতুব রহ. বললেন, এই দায়িত্ব আপনাকে কে দিয়েছে?

ইমাম বললেন, সরকার দিয়েছে।

সাইয়্যিদ কুতুব রহ. বললেন, এর বিনিময়ে কি আপনি বেতন পান?

ইমাম বললেন, হ্যাঁ আমি সরকার থেকে বেতন-ভাতা পাই।

তখন সাইয়্যিদ কুতুব রহ. সেই ইমাম সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলেন,

আপনি কি জানেন কী কারণে আমাকে ফাঁসি দেয়া হচ্ছে?

ইমাম বললেন, না বেশি কিছু জানি না।

সাইয়্যিদ কুতুব রহ. বললেন, **আপনি আমাকে যেই কালিমা পড়াতে এসেছেন, সেই কালিমার ব্যাখ্যা লেখার কারণেই তো আমাকে ফাঁসি দেয়া হচ্ছে। কি আশ্চর্য! যেই কালিমা পড়ানোর কারণে আপনি বেতন-ভাতা পান সেই কালিমার ব্যাখ্যা মুসলিম উম্মাহকে জানানোর অপরাধেই আমাকেই ফাঁসি দেয়া হচ্ছে। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, আপনার কালিমার বুঝ আর আমার কালিমার বুঝ এক নয়। আপনার কোন প্রয়োজন নেই; আপনি যেতে পারেন।**

এটাই হলো চরম বাস্তবতা। আমাদের আজকের সমাজেও দেখা যায়, অনেকেই তোতা পাখির মতো বুলি আওড়ানো কালিমার দাওয়াত দিচ্ছেন, কিন্তু তারা কোন বাঁধার সম্মুখীন হন না। চতুর্দিক থেকে কেবল নুসরাত আর নুসরাত পাচ্ছেন।

বর্তমান জালিম শাসকরাও আজ কুরআনের ব্যাখ্যা দিচ্ছে। তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য অনেক নামধারী আলেমরাও দ্বীন প্রচার করছে। কিন্তু যেই কালিমা তাইয়্যিবা এক আল্লাহর সর্বময় ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের বাণী শোনায়, যেই কালিমার অনুসারীদের জন্য মানবরচিত সকল শাসনব্যবস্থার অধীনে থাকা হারাম হয়ে যায়, যেই কালিমার বাণী মক্কায় প্রচার করার কারণে চতুর্দিক থেকে প্রিয়নবী সা. বাঁধার সম্মুখীন হয়েছিলেন; সেই একই কালিমা আজ সমাজে প্রচার করা হচ্ছে তার প্রাণশক্তি আর মর্মকে বিলুপ্ত করে। যার ফলে যে কালিমা বলছে সে নিজেও বুঝে না যে, সে কী বলছে আর যার কাছে কালিমার দাওয়াত দিচ্ছে সে কালিমার দাওয়াতও গ্রহণ করছে আবার গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্রসহ মানবরচিত শাসনব্যবস্থার নিঃস্বার্থ কর্মী বলেও গর্ববোধ করছে।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে কালিমার সঠিক ব্যাখ্যা জানার এবং বুঝার তাওফীক দিন। আমীন।



যে আক্ষেপ ছিল মহাবীর হযরত খালিদের...

-জাবের আব্দুল্লাহ

হিজরি একুশ সালের কোন এক দিনের কথা। মহাবীর হযরত খালিদ সাইফুল্লাহ রাযি. ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। 'সাইফুল্লাহ' বা 'আল্লাহর তরবারী' আখ্যায়িত এই মহাবীর জীবনে কতবার যে যুদ্ধের ময়দানে শত্রু সেনার কাতারে ঢুকে পড়েছেন খোলা তরবারী হাতে তার কোন ইয়ত্তা নেই। যিনি নিজেই যুদ্ধ জয়ের একটি স্বতন্ত্র ইতিহাস। না, তবুও তিনি পরিতৃপ্ত নন। জীবন-মৃত্যুর এই সন্ধিক্ষণেও তাঁর দুঃখের কোন শেষ নেই। কারণ, তাঁর শত শত সাথীরা শাহাদাত বরণ করেছেন, কিন্তু তিনি শহীদ হতে পারেননি।

আজ বিছানায় শুয়ে শুয়ে তাঁকে মৃত্যুর প্রহর গুণতে হচ্ছে। ঠিক এমতাবস্থায় এক পুরোনো বন্ধু তাঁকে দেখতে এলেন। হযরত খালিদের বিছানার পাশে তিনি বসলেন। খালিদ রাযি. নিজের ডান পা'র উপর থেকে কাপড় সরিয়ে তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বন্ধুর নিকট জানতে চাইলেন, 'তুমি কি এ পায়ে এক মুষ্ঠি পরিমাণ এমন জায়গা দেখতে পাও, যেখানে অস্ত্রের কোন আঘাত চিহ্ন নেই?' বন্ধুটি সেদিকে ভাল করে দেখার পর মাথা নাড়িয়ে বলে ওঠলেন, 'না'। এরপর হযরত খালিদ রাযি. তার বাম পা বের করে তা দেখিয়ে একই প্রশ্ন করলেন, বন্ধুটি ভালো করে দেখার পরে এবারেও বলে ওঠলেন, 'না, এক মুষ্ঠি পরিমাণ জায়গাও এমন নেই, যেখানে কোন তলোয়ার বা বর্শা কিংবা তীরের আঘাত চিহ্ন নেই'। খালিদ রাযি. ঠিক একইভাবে তার ডান হাত, বাম হাত এক এক করে দেখিয়ে একই প্রশ্ন করলে বন্ধুটিও সেই একই উত্তর দিলেন। এবারে তিনি বুকের ওপর থেকে চাঁদর সরিয়ে বন্ধুকে দেখালেন। বন্ধুটি অবাক বিস্ময়ে দেখলেন সেখানে বল্লম, তলোয়ার আর তীরের অসংখ্য আঘাত চিহ্ন। এবারে হযরত খালিদ রাযি. তাঁর বন্ধুকে উদ্দেশ্য করে বলে ওঠলেন, 'তুমি কি বুঝতে পারছ না যে, আমি কী মরিয়া হয়ে শাহাদাত পাবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু আমার কপালে শাহাদাত জুটল না'। তখন তাঁর বন্ধু জবাব দিলেন, 'তুমি যুদ্ধের ময়দানে শত্রুর আঘাতে মরতে পারো না, তেমনটা হওয়া সম্ভবপর ছিল না।' এ কথা শুনে হযরত খালিদ অনুযোগ করে ওঠলেন, 'কেন নয়? আমার পাশেই তো কত সাথীকে লুটিয়ে পড়তে দেখেছি, দেখেছি হাসতে হাসতে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে জান্নাতের কাফেলায় শামিল হতে, তাহলে আমার বেলায় কেন নয়!' বন্ধুটি শান্ত ও ধীর গলায় বলে ওঠলেন, 'আপনি বোঝার চেষ্টা করুন, আপনার ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেছে সেই দিনই, যেদিন প্রিয় রাসুলুল্লাহ সা. আপনাকে সাইফুল্লাহ (আল্লাহর তরবারী) খেতাব দিয়েছিলেন। যুদ্ধের ময়দানে কোন কাফেরের হাতে এ তরবারীর যবনিকাপাত হতে পারে না, সেটা অসম্ভব। কারণ তার মানে এই দাঁড়াতো যে, আল্লাহর দুশমন কোন কাফেরের হাতেই স্বয়ং আল্লাহর তরবারীর যবনিকাপাত! এটা কখনই সম্ভবপর নয়। খালিদ রাযি. কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। বোঝার চেষ্টা করলেন যুক্তিটুকু। তিনি আল্লাহকে স্মরণ করতে থাকলেন, কিন্তু এই মুহূর্তেও যুদ্ধের ময়দানে শাহাদাত না পাবার দুঃখটুকু তার গেল না। তিনি বলে ওঠলেন, 'শাহাদাতের জন্য কত চেষ্টা করেছি, আর আজ বিছানায় শুয়ে শুয়ে মরছি, একটা বুড়ো উঁট যেমন তার আস্তানায় পড়ে মরে, ঠিক তেমনি!' তার চোখ বেয়ে পড়ল দু'ফোটা তপ্ত অশ্রু।

কিন্তু বড়ই আফসোসের ব্যাপার, আজ আমরা আমাদের দূর্গতি থেকে মুক্তির জন্য একজন খালিদের অপেক্ষায় থাকি। অপরকে 'খালিদ' হবার জন্য বলি, কিন্তু নিজেরা সে চেষ্টা করি না। আমাদের চেষ্টা হলো; ত্বরিৎ গতিতে বড় বড় কোম্পানী আর রিয়েল এষ্টেট বিজনেসের মালিক হওয়া, যদিও মনে মনে 'খালিদ' হবার স্বপ্নটা দেখি বটে! আমরা দুনিয়াকে আঁকড়ে ধরেই ইসলামের বিজয় প্রত্যাশা করি! আত্মপ্রবঞ্চণা আর কাকে বলে..

রক্তপাত ছাড়া একটি শিশুরও জন্ম হয় না

-আবু আব্দুল্লাহ্

রক্তপাত ছাড়া একটি শিশুরও জন্ম হয়না। বাক্যটির উপর অনেকের আপত্তি! তাদের দাবি, এখন মক্কী জীবন চলছে তাই কোনো ধরনের রক্তপাত প্রয়োজন নাই।

আমি তাদেরকে বলতে চাই। আসুন, আমরা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মক্কী জীবন অনুসরণ করি।

আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি মক্কী জীবনে তায়েফের ময়দানে রক্তাক্ত হননি?
হযরত সুমাইয়্যা রাযি. কি মক্কী জীবনে শহীদ হননি?
আবু বকর রাযি. সহ প্রিয় সাহাবায়ে কেরামগণ কি আক্রমণের শিকার হননি?
সাহাবারা কি নির্যাতিত হয়ে আত্মরক্ষার্থে মদীনা-হাবশায় হিজরত করেননি?
এদের শরীর দিয়ে কি বের হয়েছিল? পানি? মধু? না রক্ত?
আমাকে কি দেখাতে পারবেন, অন্তত একজন মক্কী জীবনের দাবিদার যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতো রক্তাক্ত হয়েছে? যে সুমাইয়্যা-রাযি.'র মতো শহীদ হয়েছে? যে আবু বকর-রাযি.'র মতো নির্যাতনের শিকার হয়েছে?

কেনো? কারণ, তারা সর্বদা সুবিধার কাঙ্গাল, স্বার্থ পূজারী। তারা শুধু বলে, আমাদের আল্লাহ 'রাহমান রাহীম!' (অতি দয়ালু পরম করুণাময়) তারা একথা বলে না যে, আমাদের আল্লাহ 'মুনতাকিম' (প্রতিশোধ গ্রহণকারী) ও 'যুল ইকাবিশশাদীদ' (কঠিন শাস্তি প্রদানকারী)

তারা শুধু বলে, আমাদের নবী শুধু 'নবীউর রাহমাহ' (রহমতের নবী)! তারা একথা বলে না যে, আমাদের নবী হচ্ছেন, 'নবীউল মালহামাহ' (যুদ্ধের নবী!)
তারা শুধু বলে, মুমিনরা পরস্পর পরস্পরের ভাই ভাই! তারা একথা বলে না, মুমিনরা কাফিরদের বিরুদ্ধে কঠোর!

আপনারা মক্কী জীবন অনুসরণ করুন তাতে আপত্তি নেই, কিন্তু মক্কী জীবন নিয়ে ভাওতাবাজি করার অধিকার আপনাদের কে দিয়েছে?
কতকাল আর ভেজা বিড়ালের মতো ম্যাঁওম্যাঁও করবেন। এবার সিংহের মতো গর্জন দেওয়া শিখুন।

মনে রাখুন, যদি শৃগালের মতো এক হাজার বছর বাঁচার চেয়ে সিংহের মতো একদিনই বাঁচা যথেষ্ট হয়,তাহলে পিপীলিকার মতো এক কোটি বছর বাঁচার চেয়ে বাঘের মতো এক ঘন্টা বাঁচাই যথেষ্ট!

সিদ্ধান্ত আপনার হাতে, সিংহ হয়ে বাচবেন? না বাঘ হয়ে? না পিপীলিকা হয়ে?

ইমাম আবু হানিফা রহ.

(৮০-১৫০হিজরী/৬৯৯-৭৬৭ঈসায়ী)

-মাওলানা আসেম ওমর

তোমরা কে? অথচ তারা ছিলো পিতা তোমাদের,
হাতে হাত রেখে অপেক্ষমান কিয়ামতের?

ইমাম আবু হানিফা রহ. ৮০ হিজরীতে কুফায় জন্মগ্রহণ করেন। সেখানেই তিনি শিক্ষা লাভ করেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে সাহাবায়ে কেরামের সাক্ষাৎ লাভের মর্যাদা দান করেন। তাঁদের মধ্যে আনাস বিন মালেক, আব্দুল্লাহ বিন আবি আউফ, সাহল বিন সাআদ আস সাঈদী, আবু তোফাইল এবং আমের বিন ওয়ায়েলাহ রাযি.ও ছিলেন। ইমাম শাফেয়ী রহ. এর একটি কবিতা

আবারো আলোচনা কর নুমানের
তার আলোচনা মেশক আমাদের,
মেশক-আম্বর যতবার নাড়বে
ততো বেশি ঘ্রাণ ছড়াবে।

ইলমী মর্যাদা

সুফিয়ান সাওরী রহ. এবং আব্দুল্লাহ বিন মুবারক রহ. এর বাণী, আবু হানিফা রহ. তাঁর যুগে গোটা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ফিকাহবিদ ছিলেন। হাফেজ যাহাবী রহ. ইমাম আবু হানিফা রহ. এর গুণাবলি বর্ণনা করতে গিয়ে লেখেন, যতদূর ফিকাহ, সমসাময়কি সিদ্ধান্ত এবং তার সূক্ষ্মতার সম্পর্ক রয়েছে, তা তার পর্যন্তই শেষ হয়েছে। আর মানুষ এ ব্যাপারে তার পরিবারভূক্ত। তিনি আরো লেখেন, হাফস বিন গিয়াস বলেন, আবু হানিফার কথা চুলের চেয়ে সূক্ষ্ম। জাহেল ছাড়া কেউ তাতে ভুল ধরতে পারে না। (সিয়ারু আলামিন নুবালা।)
জারীর রহ. বলেন, আমাকে মুগীরা বলেছেন, আবু হানিফার মজলিসে বসো ফকীহ হয়ে যাবে। যদি ইবরাহীম জীবিত থাকতেন তাহলে তিনিও তার মজলিসে বসতেন। (সিয়ারু আলামিন নুবালা।)

তাকওয়া

বর্ণিত আছে, তিনি সাত হাজার বার কুরআন খতম করেছেন। খতীবে বাগদাদী রহ. নিজের সনদে বর্ণনা করেন, ইমাম সাহেব রহ. রাতে নফল পড়তেন। প্রতি রাতে একবার কুরআন খতম করতেন। তিনি এতো কান্না করতেন যে, তার উপর প্রতিবেশীদের দয়া হতো। তার মৃত্যু এমন স্থানে হয়েছে, যেখানে তিনি সত্তর হাজার বার কুরআন খতম করেছেন। জানাযাতে এতো ভীড় হয়েছিলো যে, ছয় বার জানাযা পড়া হয়েছিলো।-আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া।

হাফেজ যাহাবী রহ. সাক্ষী দেন, তিনি দয়ালু, দানশীল, পবিত্র, আল্লাহওয়ালা, তাহাজ্জুদগুজার, অধিক তেলাওয়াত এবং কিয়ামুল লাইলে উল্লেখযোগ্য ছিলেন। (তারীখুল ইসলাম লিয যাহাবী, খন্ড ৯ পৃ: ৩০৬)

সবশেষে ইমাম যাহাবী রহ. লেখেন, আবু হানিফা রহ. এর অবস্থা এবং মর্যাদা এই ইতিহাস বহন করতে অক্ষম। ইমাম আবু হানিফা রহ. এর ইলমী অবস্থান, তাকওয়া পরহেযগারী, সন্দেহযুক্ত বিষয় থেকে বেঁচে থাকার উপমা তিনি নিজেই। এই ঘটনা থেকে তাঁর সতর্কতার অনুমান করা যায়-

একবার কুফাতে এক মহিলার বকরি হারিয়ে যায়। এর কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিলো না। তাই তিনি ততদিন পর্যন্ত বকরির গোশত খাননি যতদিন এই বকরির কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি যে, বকরিটি মারা গেছে। তাঁর আশঙ্কা ছিলো, হতে পারে কেউ এই বকরি জবাই করে বাজারে বিক্রি করে দিয়েছে। চিন্তা করুন! কোনো মানুষ কেবল সন্দেহবশত কতো দিন গোশত খাওয়া থেকে বিরত থাকতে পারে? এক সপ্তাহ, এক মাস, বেশি থেকে বেশি কয়েক মাস? তিনি সাত বছর পর্যন্ত বকরির গোশত খাননি। সাত বছর পর যখন জানতে পারলেন ওই বকরি মরে গেছে, তখন তিনি গোশত খেতে শুরু করলেন। একদিকে তাঁর ইলমী খেদমত, অপরদিকে সত্যবাদি, অমুখাপেক্ষিতা, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ, জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ এবং শাসকগোষ্ঠীর সাথে কী ভূমিকাই না রেখেছেন। খলিফা আবু জাফর মনসুর তাঁকে প্রধান বিচারক নিয়োগ দিতে বারবার অনুরোধ করতে থাকেন, কিন্তু তিনি তা কবুল করেননি। তার উপহারও তিনি কবুল করতেন না।

কারাগারে ইমামে আজম রহ. এর উপর নির্যাতন

একদিন খলিফা মনসুর কসম করে বলল, আপনাকে আমার প্রস্তাব কবুল করতেই হবে। তার জবাবে তিনিও কসম করে বললেন, আমি প্রস্তাব কবুল করবো না। মানসুরের দারোগা বলল, দেখুন! আমীরুল মুমিনীন কসম করেছেন, আপনিও কসম করছেন। তিনি জবাব দিলেন, আমীরুল মুমিনীন নিজের কসমের কাফফারা আদায় করতে আমার চেয়ে অধিক সক্ষম। (সিয়ারু আলামিন নুবালা লিয যাহাবী)



সুতরাং মানসুর কারাগারে বন্দী করার আদেশ করলো। অবশেষে জেল থেকে জানাযা বের হয়। মানসুর ইমামে আজম রহ. কে তার পুলিশ অফিসার হামিদ ত্বোছির হাওয়ালা করে দেয়। হামিদ ত্বোছি বলেন, আমিরুল মুমিনীন যে ব্যক্তিকেই আমার হাওয়ালা করে দেন, আমাকে বলেন আমি যেন তাকে কতল করে ফেলি অথবা হাত-পা কেটে দিই অথবা কঠোর শাস্তি প্রদান করি।

ইমাম আজম রহ. খুবই প্রশান্ত অবস্থায় জবাব দিলেন, তোমাকে যে আদেশ দেয়া হয়েছে তা দ্রুত বাস্তবায়ন করে ফেল। (সিয়ারু আলামিন নুবালা লিয যাহাবী)

ফকীহ আবু আব্দুল্লাহ সমীরি রহ. বলেন, ইমাম সাহেব রহ.কে কারাগারে অমানবিক নির্যাতন করা হয় এবং তিনি কারাগারেই ইন্তিকাল করেন। (সিয়ারু আলামিন নুবুলা লিয যাহাবী)

হিশাম বিন আব্দুল মালেক এর শাসনামলে খান্দানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেরাগ সায়্যিদুনা হুসাইন রা. এর পৌত্র, যায়েদ বিন আলী বিন হুসাইন রা. হিশামের বিরুদ্ধে জিহাদের ঝাণ্ডা উঁচু করেন। ইমাম সাহেব রহ. এর সাহসিকতা এবং বাহাদুরী দেখুন, প্রকাশ্যে তিনি যায়েদ রহ. এর রক্ষণাবেক্ষণ করেন। তিনি তার খেদমতে দশ হাজার দেরহাম পাঠান এবং উপস্থিত হতে না পেরে ওজর পেশ করেন। তারপর হাসান রা. এর বংশধর থেকে মুহাম্মাদ যুন নাফস যাকিয়্যাহ রহ. মদীনা মুনাওয়ারায় এবং তার ভাই ইবরাহিম বিন আব্দুল্লাহ কুফায় মানসুরের বিরুদ্ধে জিহাদের ঝান্ডা বুলন্দ করেন। ইমাম মালেক রহ. মদীনা মুনাওয়ারাতে মুহাম্মাদ যুন নাফস যাকিয়্যাহকে এবং আবু হানিফা রহ. কুফাতে ইবরাহিম বিন আব্দুল্লাহকে সহযোগিতা করেন। তিনি কিছু টাকা-পয়সাও তার খেদমতে পাঠান। তিনি মনসূরের সেনা অফিসার হাসান বিন কহতবাকে ইবরাহিম রহ. এর মোকাবিলা করা থেকে বিরত রাখেন। যার ফলে সে খলিফার কাছে ওজর পেশ করে। মানসুর ইমাম সাহেবের বিরুদ্ধে যে প্রতিশোধ নেয়, তা মূলত এই কারণেই। সে প্রধান বিচারকের পদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানকে উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে বাহানা বানায়। কারাগারে তাঁকে কঠোর নির্যাতন করা হয়। তারপর বিষ প্রয়োগে তাকে শহীদ করা হয় এবং কারাগার থেকেই জানাযা বের হয়।

ইমাম সাহেব রহ. এর জানাযা জেল থেকে বের হয়েছে বলা খুবই সহজ। কিন্তু একটু চিন্তা করুন, ইমামে আজম রহ. এর জানাযা কারাগার থেকে বের হয়েছে। হাফেজ যাহাবী রহ. বলেন, তিনি শাহাদাতের মৃত্যু বরণ করেছেন। যার ব্যাপারে আলী বিন আছেম রহ. বলেন, যদি ইমাম আবু হানিফা রহ. এর ইলম ওজন করা হয়, তাহলে তার যমানার সকলের ইলমের চেয়ে বেশি হবে। (সিয়ারু আলামিন নুবালা, খন্ড ৬ পৃ: ৪০৩।)

এই সেই আবু হানিফা রহ. আমরা যার নাম নেই । আমরা যার তাকলীদ করার দাবি করি। যার মর্যাদা, বড়ত্ব আর মাসায়েল পড়তে এবং পড়াতেই আমাদের যিন্দেগী শেষ হয়ে যায়। আফসোস! যদি কখনো ভাবতেন তিনি কী ছিলেন? কী দরদ ছিলো তাঁর দীনের প্রতি? কতো ব্যথা ছিলো দীনের জন্য? বৃদ্ধ বয়সে তিনি মুরীদানের বেষ্টনীতে থাকার পরিবর্তে কারাগারের একাকীত্বকেই বেছে নিলেন। তিনি কেমন ফিকাহ পড়েছিলেন, কোনো ব্যাখ্যা (তাবিল) অথবা কোনো ফিকহী শাখার (জুযের) বাহানা করেননি। শেষ বয়সে শাগরীদদের সভায় ঘুরে বেড়ানোর পরিবর্তে যিন্দানখানার অন্ধকার কুঠুরীকেই অগ্রাধিকার দিলেন। দরসের মসনদের গুরুত্বও 'মাসলাহাত আর হেকমতের' জুব্বা হয়ে সামনে এসেছিলো। এ কথা বুঝানোর চেষ্টাও করা হয়েছিলো যে, বর্তমান খলিফার (মানসুর) বিরুদ্ধে যুদ্ধকে কিভাবে জায়েয বলেন? এটা তো মুসলমানদের পারস্পরিক লড়াই। আপনি ফিকাহ পড়াতে থাকুন। চুপ থাকুন। (প্রধান কাজী হওয়ার) প্রস্তাব কবুল করলে কী সমস্যা? এটাও তো ইসলামী খেলাফতের কাজীর প্রস্তাব। কিন্তু সাবেতের (নুমান বিন সাবেত) বেটার কদম 'সাবেত'ই (সুদৃঢ়) থাকলো। একবার যার জবাব 'না' এসেছে সুতরাং ব্যস; জান গেলেও সেই 'না'কে 'হ্যাঁ'তে রূপান্তর করা যাবে না। এ কথা চিন্তার বিষয় যে, তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গি এমন যুগে ছিলো, যাকে সর্বোত্তম তিন যুগের মধ্যে ধরা হতো। খেলাফত প্রতিষ্ঠিত ছিলো। চারদিকেই ইসলামের জয়গান। ইসলামের বিধিবিধান কার্যকর হচ্ছে। মুসলমানদের জান, মাল, ইজ্জত, আব্রুর উপর কাফেরদের পক্ষ থেকে কোনো ভয় নেই। খলিফাও বর্তমার শাসকগোষ্ঠী থেকে কোটি গুণ ভালো। সে নামায পড়াকে বাতিল করেছে, না জিহাদকে। কল্পনা করুন, ইমাম সাহেব যদি জানতে পারেন, তার ভক্তরা কাফেরদের গোলামী করছে, তাঁর ফিকাহ থেকে ইহুদি, নাসারা এবং হিন্দুদের আনুগত্যকে জায়েয ফতোয় দেয়া হচ্ছে, এর উপর আবার গর্ববোধও করছে যে, সে দীনের বড় খেদমত করছে। কিয়ামতের দিন যদি তিনি আমাদের কলার ধরে ফেলেন, তাহলে কী জবাব দেবো? যেই ইমামের দৃষ্টিতে সোনালি তিন যুগের শাসকগোষ্ঠী বাতিল, তাদের বিরুদ্ধে জিহাদকারীদের সরাসরি সঙ্গ দিয়েছেন, যদি তিনি জানতে পারেন তাঁর অনুসারীরা হিন্দুস্তানে হিন্দদের গোলামীতে সন্তুষ্ট, তাঁর অনুসারীরা (দারুল হারব) আমেরিকা-বৃটেনে বসবাস করছে, তারা জিহাদ করছে না, তাগুতদেরকে নিজেদের আমীর বলে স্বীকার করে নিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে জিহাদকে নাজায়েয বলছে, আল্লাহর দুশমনদের সাহায্যকারীদের হক প্রমাণিত করতে ইমাম সাহেবের ফিকাহ থেকে দলিল পেশ করছে, তাহলে কী জবাব দিবো? হে ইমাম আবু হানিফার অনুসারীগণ! আপনারা! কি কখনো ভেবেছেন, কিয়ামতের দিন এই পবিত্র আত্মার মুখোমুখি কিভাবে হবেন? আমেরিকার আনুগত্যের উপর সন্তুষ্ট থেকে, ইসলামের বিরুদ্ধে ঘোষিত যুদ্ধে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুশমনদের সারিতে দাঁড়িয়ে, তাবিলের (ব্যাখ্যা) বাহানা দিয়ে এমন ব্যক্তিত্বের সাথে বহস করা যাবে, যার ফিকহী সূক্ষ্মতা এবং গভীরতা দুনিয়া জুড়ে খ্যাত? আবারো পড়ুন। দিলের চোখ খুলে পড়ুন। ইমামে আজম রহ. এর জানাযা জেল থেকে বের হয়েছে। চাবুকের আঘাত খেয়েছেন, তিলে তিলে কঠিনতম শাস্তি সহ্য করে মাহবুবে হাকিকীর (আল্লাহর) সাথে মিলেছেন। আসমান ও জমিনের প্রশস্ততা বরাবর রহমত বর্ষিত হোক নুমান বিন সাবেত আবু হানিফা রহ. এর উপর। যিনি নিজের জীবন কুরবান করে শরীয়তের আব্রু হেফাজত করেছেন। আমীন।

ব্রিটেনের আফগান মিশনের চরম ব্যর্থতা

হাসান ইমতিয়াজ

সদ্য বিদায়ী বছরের ২৬ অক্টোবর রবিবার দিনটি আন্তর্জাতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ছিল গুরুত্বপূর্ণ। আমেরিকা এবং ব্রিটেনের সৈন্যবাহিনী আফগানিস্তানের হেলমান্দ প্রদেশের তালিবান-মুজাহিদদের একের পর এক প্রচণ্ড হামলার মুখে ১৩ বছরের আগ্রাসন অভিযান অধরা রেখেই পরিসমাপ্তির ঘোষণা দিয়েছে। ব্রিটেন আফগানিস্তানে তাদের সবচেয়ে বড় সামরিক ঘাঁটি 'ক্যাম্প বেসন' আনুষ্ঠানিকভাবে আফগান সরকারী বাহিনীর কাছে অর্পণ করে লজ্জাজনকভাবে রণেভঙ্গ দিয়েছে। ব্রিটেনের সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাসে বহির্দেশীয় যুদ্ধের বিবেচনায় এ যুদ্ধ ছিল সবচে' ব্যয়বহুল ও দীর্ঘ। সর্বোপরি ফলাফলশুন্য। এ যুদ্ধে তাদের ব্যর্থতা আর গ্লানি ছাড়া কিছু অর্জন হয়নি-এটা তারাও অকপটে স্বীকার করছে। ব্রিটেনের সাধারণ নাগরিকরা এমন ব্যর্থ মিশনের ব্যাপারে সরকারের ভূমিকায় তীব্র নিন্দা জানিয়েছে। শুধু তাই নয় এটাকে তারা জাতির গায়ে কলঙ্ক লেপন হিসেবেই মনে করছে। সাবেক প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারের সময় এ মিশন শুরু হয়েছিল। অতঃপর গার্ডন ব্রাউন এসে মিশন সফল করতে প্রাণপণ চেষ্টা তদবীর করেছে। শেষ পর্যন্ত ডেভিড ক্যামেরনের হাতে এর কবর রচনা হল। আর ক্ষতি যা হবার তাতো হলই। নিজেদের অত্যাধুনিক সমরাস্ত্রের স্তূপীকৃত ধ্বংসাবশেষ, সহস্রাব্দ বীর (!) সেনা বাহিনীর চরম পীড়াদায়ক বীভৎস লাশের স্মৃতি। বিশ্বাস হচ্ছে না! তাহলে শুনুন তাদের স্বীকারোক্তিই। তের বছরের যুদ্ধে ৪৫৩টি বীভৎস লাশের কফিন ব্রিটেন পৌঁছেছে। আহত হয়েছ ২,৪০০, আর ৫ হাজারের বেশি সেনাসদস্য মানসিক রোগে আক্রান্ত হয়েছে।

ব্রিটেন আফগানিস্তানের হেলমান্দ প্রদেশকেই বেছে নিয়েছিল ঘাঁটি স্থাপনের জন্য। কিন্তু আপ্রাণ চেষ্টা করেও প্রদেশের ১৪টি জেলার মধ্যে মাত্র ৩টি জেলায় ঘাঁটি স্থাপন করতে সমর্থ হয়েছে। তন্মধ্যে সবচেয়ে বড় ঘাঁটিই ছিল 'ক্যাম্প বেসন'। গত ২৬ অক্টোবর সেখানে থেকে ব্রিটেন ও আমেরিকার পতাকা চিরদিনের জন্য অবনমিত হয়েছে।

আমেরিকার পর ব্রিটেনই ছিল দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সৈন্য প্রেরণকারী দেশ। যাদের মোট নয়হাজার সৈন্য আফগানিস্তানের হেলমান্দ প্রদেশে নিযুক্ত ছিল। যাদের পেছনে এখন পর্যন্ত ব্রিটেনের ৩১ বিলিয়ন পাউন্ড ব্যয় হয়েছে। চলতি বছরে (২০১৪) যা ৪০বিলিয়ন পর্যন্ত পৌঁছবে। আফগানিস্তানে ব্রিটিশ সেনাদের ১৩ বছরের মিশন ব্যর্থ হওয়ার কারণ হল– তাদের সর্বাত্মক চেষ্টা সত্ত্বেও মুজাহিদগণ হেলমান্দ প্রদেশে তাদের যমদূত হয়ে দেখা দিয়েছে। পুরনো শত্রু তাই বোঝাপড়াটা একটু বেশিই ছিল। আর তাইতো অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় হেলমান্দ প্রদেশেই সর্বোচ্চ সংখ্যক বিদেশী সৈন্য মারা গেছে। এখন তারা বুঝতে পারছে আফগানিস্তানে সৈন্য পাঠানো ছিল মারাত্মক ভুল। ব্রিটেনের প্রসিদ্ধ লেখক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক ফ্রাংক লেডউইজ (Frank ledwidge) আফগানিস্তানের হেলমান্দ প্রদেশে ব্রিটিশ মিশন সম্পর্কে (Investment in blood) 'রক্তের বেচাকেনা' নামে বৃহৎ কলেবরের একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। যেখানে লেখক ব্রিটিশ বাহিনীর ইরাক ও আফগানিস্তানের ব্যর্থ মিশন এবং ক্ষয়-ক্ষতি ও হতাহতের সঠিক পরিসংখ্যান বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। লেখক আফগানিস্তানে নিজ দেশের সৈন্যদের পরের জন্য আত্মাহুতি দানকারী বলে সম্বোধন করেছেন। সাথে সাথে নিজ দেশের রাজনীতিবিদদের সম্বোধন করে অভিযোগের সুরে লিখেন, আমাদের সেনাদের এমন শক্তির সাথে মোকাবেলা করার জন্য পাঠানো হয়েছে, যারা প্রথমেই এ বাহিনীর লড়াকু মনোভাব হরণ করে নিয়েছে। (তার ভাষায়) এখন আমাদের বাহিনী পরাজয়ের গ্লানি বহন করে আফগানিস্তান ছেড়ে যাচ্ছে। এর পর এ বাহিনী পৃথিবীর কোথাও আর সামরিক সফলতা অর্জন করতে পারবে বলে মনে হয় না। কেননা এ যুদ্ধে তাদের মনোবল ভেঙ্গে গেছে। কারণ (ইতিপূর্বের তিনটি যুদ্ধের যথাক্রমে ১৮৪২, ১৮৮০, ১৯১৯- গ্লানি দূর করার মিশন ও যে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে।) ফ্রাংক লেডউইজ বলেন, আফগানিস্তানে ব্রিটিশ সেনাদের পিছনে যে বিপুল অর্থ ব্যয় করা হয়েছে এ অর্থে ব্রিটেনে এক হাজার প্রাথমিক স্কুল কিংবা আগামী দশবছর পর্যন্ত পুরো ব্রিটেনের শিক্ষার্থীদের উচ্চতর শিক্ষাদান অথবা, পাঁচ হাজার পুলিশ এবং ধর্মযাজকের যাবতীয় ব্যয়ের জন্য যথেষ্ট ছিল। কিন্তু আফসোসের সাথে বলতে হয় এ বিশাল অর্থ এমন এক যুদ্ধের পিছনে ব্যয় হয়েছে যার ফলে ব্রিটেন ক্ষয়-ক্ষতির গ্লানি ছাড়া কিছুই পায়নি। আফগানিস্তানে ব্রিটেনের ব্যর্থতা এ জন্যও গুরুত্বপূর্ণ যে, ব্রিটেন আফগানিস্তানের হেলমান্দ প্রদেশে তালেবানের শক্তি সামর্থ্যকে ধুলিস্মাৎ করার জন্য হাজারো আমেরিকান মেরিন সৈন্য এবং ন্যাটোর সশস্ত্র সৈন্যবাহিনীর সহযোগিতা নিয়েছে। যার ফলে মোট সৈন্য সংখ্যা ৪০ হাজার পর্যন্ত পৌঁছেছে। কিন্তু হলে কী হবে। এতদসত্ত্বেও প্রত্যাশিত সফলতা অধরাই রয়ে গেছে। এখন তারা ব্যর্থতার গ্লানি মাথায় নিয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেছে। পরাজয়ের বেদনা যে তাদের মর্মে আঘাত হেনেছে তা ভালভাবে উলব্ধি করতে পারবে তারাই যাদের আত্মীয়-স্বজনের লাশ বাক্সবন্দি হয়ে ব্রিটেনে পৌঁছেছে। ব্রিটিশ সেনাদের লাশের বহর যে স্বজাতির গালে কষে চড় মেরেছে তা বুঝা যায় বর্তমান প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর কথায়। তিনি অত্যন্ত মলিন মুখে এ কথা উচ্চারণ করেন যে, আমাদের সেনাবাহিনী আর কখনো আফগানিস্তান যাবে না।

বিস্মৃতির গহ্বরে পূর্ব তুর্কিস্তান...

পূর্ব তুর্কিস্তান সম্পর্কে ১০টি বাস্তব তথ্য আপনার জানা আছে কি?

(১) ঐতিহাসিকভাবে পূর্ব তুর্কিস্তান কখনোই চীনের অংশ ছিল না; বরং এই ভূমিকে 'হান' চীনারা (হান : চীনাদের একটি জাতি) উপনিবেশে পরিণত করেছিল, যেমনিভাবে ব্রিটিশরা আমাদের উপমহাদেশকে উপনিবেশে পরিণত করেছিল। এই ভূমির অবস্থান চীনের মহা প্রাচীরের বাইরে। আমরা জানি, চীনের মহা প্রাচীর ছিল চীনের সীমানা নির্ধারক স্থাপনা- যা বহিঃশত্রুদের আক্রমণ থেকে সুরক্ষিত থাকতে চীনারা নির্মাণ করেছিল। পূর্ব তুর্কিস্তান যেমনি চীনের প্রাচীরের বাইরে, ঠিক তেমনি Jade Gate (জেড ফটক) এর পশ্চিমে। সুতরাং ইতিহাস সাক্ষী, কস্মিনকালেও পূর্ব তুর্কিস্তান চীনের অংশ ছিল না। তাই, শুধুমাত্র পূর্ব তুর্কিস্তান নাম পরিবর্তন করে জিনজিয়াং/ সিংকিয়াং (অর্থ: নতুন রাজ্য) রাখলেই অতীত ইতিহাস বদলে যাবে না।

(২) বিগত দুই সহস্রাব্দের মধ্যে ১৮০০ বছরই পূর্ব তুর্কিস্তান চীনের কবল থেকে মুক্ত ছিল। আর ১০০০ বছর পুরনো ইসলামী ইতিহাসের কথা হিসাব করলে, দীর্ঘ ৭৬৩ বছর পূর্ব তুর্কিস্তানের মুসলিমরা স্বাধীন থাকলেও, বর্তমানে ও অতীতের বিভিন্ন সময় মিলিয়ে মোট ২৩৭ বছর তারা চীনের কাছে পরাধীন আছে।

(৩) ১৯৪৯ সালের হিসাব অনুযায়ী পূর্ব তুর্কিস্তানের ৯৩% জনসংখ্যা ছিল উইঘুর বা তুর্কি মুসলিম। কিন্তু এ সংখ্যা কমে ৯৩ % থেকে বর্তমানে ৫৫% এ নেমে এসেছে। কারণ, বিগত ৬০ বছর যাবত চীনা কমিউনিস্ট সরকার মুসলিমদেরকে পূর্ব তুর্কিস্তান থেকে চীনের অন্যত্র স্থানান্তরিত হতে বাধ্য করেছে। বর্তমানে এখানে হান চীনাদের সংখ্যা ৪৫%, যেখানে কমিউনিস্টদের ক্ষমতা দখলের আগে অর্থাৎ ১৯৪৯ সালে যা ছিল মাত্র ৭%।

(৪) ১৯৪৯ সালে যখন কমিউনিস্টরা চীনের ক্ষমতা দখলের পর থেকে বেশ কয়েকবার কমিউনিস্ট সরকার পূর্ব তুর্কিস্তানে চৈনিক জাতিশুদ্ধি অভিযান চালায়। যাতে প্রাণ হারায় প্রায় ৪৫ লক্ষ মুসলিম।

(৫) চীনা সরকার এ পর্যন্ত নিজেদের নাগালে যতগুলো কুরআনের কপি কিংবা দীনি কিতাব পেয়েছে, সব বাজেয়াপ্ত করেছে। চীনা কুফফাররা এ পর্যন্ত মোট ত্রিশ হাজার সাতশটি (৩০,৭০০) মুদ্রিত আধুনিক ও হাতে লেখা প্রাচীন ইসলামী কিতাব আগুনে ভস্ম করেছে, আটাশ হাজার (২৮,০০০) মসজিদ বন্ধ করে দিয়ে সেগুলোকে 'বারে' (মদের আড্ডা) পরিণত করেছে। আঠারো হাজার (১৮,০০০) মাদরাসা গুদামঘরে পরিণত করেছে। এক লক্ষ বিশ হাজার (১,২০,০০০) আলেমেদীনকে হত্যা করেছে এবং চুয়ান্ন হাজার (৫৪,০০০) জন মুসলমানকে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে লেবার ক্যাম্পের শ্রমিক-মজুর বানিয়েছে।

(৬) চীনে কোন মুসলিমকে কুরআন শিক্ষা দেয়ার শাস্তি ১০ বছরের কারাদন্ড!

(৭) মুসলিম মহিলাদের হিজাব পরিধান আইনত সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ! কোন মুসলিমা বোন হিজাব পরে যদি ধরা পড়েন, তাকে ৫০০০ ডলার জরিমানা দিতে হয়। অথচ পূর্ব তুর্কিস্তানের একজন মুসলিমের সারা বছরের গড় আয়ই কিনা কেবলমাত্র ১০০০ ডলার!

(৮) চীন পূর্ব তুর্কিস্তানকে পারমাণবিক বোমা পরীক্ষা করার জায়গা বানিয়েছে। এ পর্যন্ত তারা সেখানে মোট ৩৫ টি পারমাণবিক বোমা পরীক্ষা করেছে, যার তেজস্ক্রিয়তার প্রভাবে দুই লক্ষ (২,০০,০০০) মুসলিম প্রাণ হারিয়েছে। অনবরত পারমাণবিক বোমা পরীক্ষার কারণে পূর্ব তুর্কিস্তানে তেজস্ক্রিয়তার এমন প্রভাব পড়েছে যে এক বছরেই (১৯৯৮ সাল) সেখানে বিশ হাজারের (২০,০০০) ওপর বিকলাঙ্গ ও প্রতিবন্ধী শিশু জন্মগ্রহণ করেছে। আর বিগত বছরগুলোতে পূর্ব তুর্কিস্তানে ক্যান্সার, প্যারালাইসিস এবং বেশ কিছু জীবন নাশক অজানা রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা গিয়েছে।

(৯) বিশ এর কম বয়সী তরুণদের কুরআন শেখা, মসজিদে আসা, এমনকি জুমার নামায পড়াও নিষিদ্ধ! আর যাদের বয়স ২০ এর ওপর তাদেরকে যদিও জুমা পড়ার সুযোগ দেয়া হয়, কিন্তু তাদেরকে নামায পড়ার জন্য মাত্র ২০ মিনিট সময় দেয়া হয়। ২০ মিনিটের চেয়ে ১ সেকেন্ড বেশী সময় মসজিদে থাকা আইনত নিষিদ্ধ এবং দন্ডনীয় অপরাধ।

(১০) পূর্ব তুর্কিস্তানকে সদা 'শান্ত' রাখতে চীনা সরকার সেখানে সেনা ও পুলিশবাহিনীর ১০ লক্ষ সদস্যকে সর্বদা মোতায়েন করে রাখে।

অনলাইন ম্যাগাজিন অবলম্বনে................

হে মুসলিম! আপনি কি জানেন...

-হাসান তারেক



কী হচ্ছে "গুয়ানতানামো" নামক কারাগারটিতে?

বর্তমান বিশ্বের এমন একটি জায়গার নাম যদি বলতে বলা হয়, যা কেবল নির্যাতিত মানুষের বন্দীশালা হিসেবে পরিচিত; তাহলে অবশ্যই বলতে হবে কিউবার কুখ্যাত "গুয়ানতানামো" নামক কারাগারটির কথা। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে যাদের এখানে নিয়ে আসা হয়, তাদের পরিচয় ঐ একটাই; তারা মহান আল্লাহ্‌কে ভালবাসেন।

সেখানে প্রথমেই যে কাজটি করা হয়, তা হল- তাদের দাড়ি কামিয়ে দেয়া হয়, মাথা ন্যাড়া করা হয়, কাপড় ছিড়ে ফেলা হয়, কমলা রং এর পোশাকে আপাদমস্তক ঢেকে দেয়া হয়, চোখ বেঁধে দেয়া হয় এবং তাদের সকল অনুভূতিকে ইন্দ্রিয় থেকে দূরে রাখার ব্যবস্থা করা হয়।

একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে তাদের সম্মান কোথায়? লোহার খাঁচার আবদ্ধ মানুষগুলোকে দেখে কী মনে হয়? তারা কি নূন্যতম মানবিক সম্মানটুকুও পেয়েছেন, নাকি চিড়িয়াখানার পশুদের চেয়েও বাজে অবস্থায় আবদ্ধ রাখা হয়েছে তাদের? একটি চিড়িয়াখানার পশুও খাঁচার ভেতর যতটুকু জায়গা পায়, সেই মানুষগুলোর ভাগ্যে ততটুকুও জায়গা নেই।

তাদেরকে খাঁচা থেকে বের হবার কোন সুযোগ দেয়া হয়না একমাত্র জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন ছাড়া। হাতে-পায়ে শিকল বাঁধা অবস্থায়, মাথা নিচু করে রাখা, কালো কাপড়ে মোড়ানো, তাদের আত্মসম্মানকে ধ্বংস করে দেয়া হচ্ছে, সব সময় তাদের মনে যে চিন্তা দানা বাঁধছে তা অনেকটা এরকম নয় কি "মুসলিমদের সেই সম্মানের দিনগুলো কোথায়? বিজয়ীদের সেই দীন কোথায়? আর কোথায় তোমরা আমাদের মুসলিম ভাইয়েরা?"...

আমাদের মুসলিম ভাইদের এই যখন অবস্থা, তখন খুব স্বাভাবিক ভাবেই কিছু প্রশ্ন নিজ মনে জেগে ওঠে। আর তা হল- কিভাবে আজকে মুসলমানেরা আরাম আয়েশে বিভোর থাকতে পারে? কিভাবে আজকে আমরা পানাহারে মত্ত আছি যখন আমাদের ভাইয়েরা শত্রুদের হাতে বন্দী? কিভাবে আজকে আমরা শান্তিতে ঘুমাই যখন আমাদের শান্তিতে রাখার জন্যে যারা উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, তাদেরকে ভোগ করতে হচ্ছে নির্মম যন্ত্রণা? কিভাবে একজন মানুষের চোখ শুকনো থাকতে পারে যখন সে তার ভাইদেরকে এইরূপ অত্যাচার ও যন্ত্রণা ভোগ করতে দেখে? মুসলিমেরা কিভাবে সন্তুষ্ট থাকতে পারে নিজেদের সন্তানদেরকে শত্রুদের হাতে তুলে দিয়ে।



না! ওরা মানুষ নয়, ওরা হল রোহিঙ্গা...

-শমসের আলী

আজ প্রতিটি আরাকানী মুসলিমের ঘরেই ওঠেছে কান্নার রোল। চলছে গণহত্যা-লুন্ঠন আর সম্ভ্রম হরণ। গ্রামের পর গ্রামে আগুন জ্বলছে। শহীদের সংখ্যা হয়েছে হাজার ছাড়িয়ে লাখ। আমার মুসলিম ভাই বোন! রোহিঙ্গাদের হাহাকারে আজ আরাকানের মাটিও যেন কাঁদছে। বল হে মুসলিম, তবুও কেন কাঁদে না তোমার হৃদয়? এপার ওপার দুপারেই আজ ওরা ঠাঁইহীন। কেউ যেন নেই ওদের দিকে মমতার চোখ তুলে তাকাবার। হায়! এ কেমন রূপ আজ মানবতার?

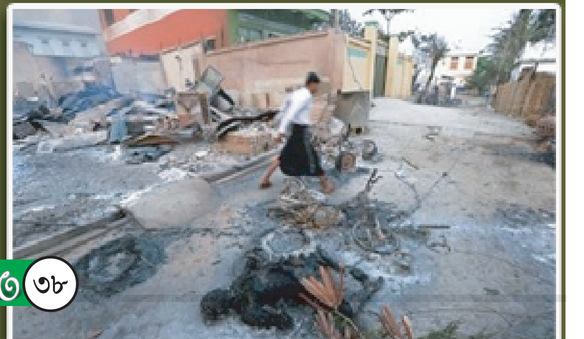
অথচ ইতিহাস সাক্ষী, রোহিঙ্গা মুসলিমরা উড়ে এসে জুড়ে বসা কোন জাতি নয়; বরং তারাই হল আরাকানের স্থায়ী বাসিন্দা। সে তারাই আজ চরম নির্যাতিত। নির্বিচারে আজ তারা হত্যার শিকার। তাদের অপরাধ কেবল একটাই ‘তারা মহান আল্লাহকে ভালোবাসে, মহান আল্লাহর কথা বলে, মহান আল্লাহর কথাই মেনে চলে।’...

হে প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোনেরা!... তোমাদের নির্যাতিত চোখের অশ্রু দেখে আমাদের হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত। ইনশাল্লাহ! সেদিন আর বেশি দূরে নয়, যেদিন শত শত মুহাম্মাদ বিন কাসিমের পদধ্বনি তোমরা শুনতে পাবে। তাদের রাইফেলের নলগুলো উঁচু হবে অহিংসবাদী বৌদ্ধদের মাথা ফাটাতে। তারা আসছে তোমাদের অশ্রু মুছে দিতে। ইনশাআল্লাহ! অচিরেই তোমরা তাদের পদধ্বনি শুনতে পাবে..











জিহাদে খোরাসানে আল্লাহ তাআলার কিছু নিদর্শন

-ক্বারী আব্দুল্লাহ ফারুকী

খোরাসানে আমেরিকা এবং পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে চলমান জিহাদের আজ এগারো বৎসর পূর্ণ হল। দুই দশক পূর্বে রাশিয়া এই পবিত্র ভূমিতে যেমনিভাবে পরাজিত এবং পর্যুদস্ত হয়েছিল ঠিক তেমনিভাবে এখন পশ্চিমারাও পরাজয়ের দিকেই ধাবিত হচ্ছে এবং নিজেদের কপালে পরাজয়ের গ্লানি মেখে নিচ্ছে। নিঃসন্দেহে আমাদের প্রতিপালক মহা পরাক্রমশালী। তিনিই রাশিয়ার বিরুদ্ধে মুজাহিদীনদেরকে বিজয় দান করেছিলেন। তিনি এখনও স্বীয় কৌশল এবং মনোনিত বাহিনীর মাধ্যমে মুজাহিদীনদের সাহায্য করছেন। খোরাসানে সংঘটিত প্রথম জিহাদে প্রকাশিত আল্লাহ তাআলার আশ্চর্য নিদর্শনাবলীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ শহীদ শায়খ আব্দুল্লাহ্ আয্যাম রহ. সংকলন করেছিলেন। গুরুত্বপূর্ণ এবং নির্ভরযোগ্য সে সংকলনটি ইসলামী ইতিহাসের পাতাকে আরও সমৃদ্ধ করেছিল। ঐ সংকলনটির মত চলমান জিহাদে প্রকাশিত অলৌকিক ঘটনাবলীকেও একটি সংকলনে একত্রিত করে মুসলিম উম্মাহর সামনে পেশ করার আবশ্যকতা দেখা দিয়েছে।

আমরা ক্বারী আব্দুল্লাহ ফারুক (উস্তাদ আহমদ ফারুক হাফিযাহুল্লাহু তাআলা -এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, তিনি এ বিষয়টির প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করতঃ এর প্রতি মনোনিবেশ করেছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর সকল প্রচেষ্টা কবুল করুন এবং এর মাধ্যমে মুসলমানদেরকে দুনিয়া এবং আখেরাতে উপকৃত করুন। আমীন।

স্বাভাবিকভাবে এই পুরো জিহাদটিই একটি স্পষ্ট কারামত। একদিকে পরিপূর্ন অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত, শক্তিশালী বিমান, নৌ ও স্থলবাহিনীসমৃদ্ধ পঁয়তাল্লিশটিরও বেশি রাষ্ট্র এবং এগুলোর অনুগত সেনাবাহিনী। অপর দিকে শুধু ঈমানী শক্তিতে বলিয়ান সীমিত সংখ্যক মুজাহিদীনদের একটি দল। কিন্তু বিশ্ববিবেককে অবাক করে দিয়ে দশ বৎসরের এই দীর্ঘ যুদ্ধে মুজাহিদগণই বিজয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। এরপরও কি আল্লাহ তাআলার কুদরত বুঝার জন্য এবং মুজাহিদীনদের সত্যতা অনুধাবন করার জন্য অন্য কোন নিদর্শনের প্রয়োজন বাকী থাকে? কিন্তু আল্লাহ তাআলার স্বীয় অনুগ্রহে বিস্ময়কর এবং কারামতপূর্ণ অসংখ্য অলৌকিক ঘটনা এই জিহাদেও সংঘটিত হওয়ার ধারা অব্যাহত রয়েছে। আর এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা মুমিনদের ঈমানে বৃদ্ধি ঘটাচ্ছেন এবং কাফের, মুনাফিকদের উপর তাঁর হুজ্জত পরিপূর্ণ করছেন।

আমি কতিপয় সম্মানিত ভাই এবং বন্ধুর ধারাবাহিক তাগিদের কারণে আল্লাহ তাআলার তাওফিক এবং সাহায্য কামনা করে এর (খোরাসানের বর্তমান জিহাদে ঘটিত আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে একত্রিত করা) প্রতি মনোনিবেশ করেছি। এই সংকলনটিতে আমার নিজ চোখে দেখা বা নির্ভরযোগ্য সূত্রে আমার ইল্মে আসা মুজাহিদীন এবং শুহাদায়ে কেরামের যে কারামত এবং আল্লাহ তাআলার নিদর্শনাবলী জানতে পেরেছি ধারাবাহিকভাবে পাঠকদের সামনে তা উপস্থাপন করার চেষ্টা করবো। (ইন্শাআল্লাহ।)

এর দ্বারা আমার প্রথম উদ্দেশ্য হল, নিজ ঈমানের নবায়ন এবং এতে মজবুতি অর্জন। সাথে সাথে আল্লাহ তাআলার কাছে এই আশাও করি যে, তিনি এর দ্বারা পাঠকদের ঈমানকে মজবুত করবেন। জিহাদ ও ক্বিতালের প্রতি তাদের অন্তরে মুহাব্বত সৃষ্টি করবেন।

জিহাদের সত্যতা, এর মাহাত্ম এবং গুরুত্ব সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য প্রকৃত দলীলাদি তো আমরা কুরআন এবং হাদীসের বক্তব্য থেকেই নিব। আর জিহাদ ও ক্বিতালের



গুরুত্ব অনুধাবনের জন্য কুরআন ও হাদীসের ঐ সকল বক্তব্যই যথেষ্ট। ঐ সকল বক্তব্য থেকে জিহাদ ও ক্বিতালের গুরুত্ব অনুধাবন করেই আমরা এই পথ অবলম্বন করেছি। কিন্তু এসকল সুসংবাদ, কারামত এবং আল্লাহ তাআলার নিদর্শনাবলি এ পথের পথিকের হৃদয়কে মজবুত করে এবং এপথে তাদের অবস্থানকে আরো দৃঢ় করে। আর এমন একটি নাযুকতম মুহূর্তে এ সকল নিদর্শনাবলি মুজাহিদদের প্রতি আল্লাহ তাআলার অসীম করুণাধারার বহিঃপ্রকাশও বটে।

যখন পৃথিবীর সকল কাফের সম্প্রদায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে আফগানিস্তানের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আর এদিক দিয়ে মুসলিম নামধারী মুরতাদ পাক-প্রশাসনের সেনাবাহিনী এবং এর সকল এজেন্সিগুলো মুজাহিদদের বিরুদ্ধে তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে রেখেছে। বাহ্যিকভাবে কাফেরদের সামরিক প্রযুক্তি উন্নতির সর্বোচ্চ চূড়া পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। রক্ত প্রবাহিতকারী এবং ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অবিশ্বাস্য সব সমরাস্ত্র তারা প্রস্তুত রেখেছে। কিন্তু এতসব সমরাস্ত্রে সজ্জিত হওয়া সত্ত্বেও ক্রুসেডারদের সাথে মুজাহিদদের জিহাদের ফলাফল মানুষের আকলকে হয়রান করে ছেড়েছে। মুজাহিদদের বিরুদ্ধে এই বস্তুনির্ভর আধুনিক সব সমরাস্ত্রে সজ্জিত কাফের বাহিনীর ভাগ্যে পরাজয় ছাড়া কিছুই মিলেনি। আর এর মৌলিক কারণ হল মানুষ বস্তুবাদে যতটাই অগ্রগতি অর্জন করুক না কেন প্রকৃতপক্ষে তারা আল্লাহ তাআলার সামান্য মাখলুক ছাড়া কিছুই নয়। আর খালেকের (সৃষ্টিকর্তার) শক্তি-সামর্থ, দাপট এবং পরাক্রমের সামনে তাদের এসব সমরাস্ত্র একটি মাছির পাখা সমতুল্য ও নয়। আল্লাহ তাআলার সুন্নাত আজ ও ঐটিই। প্রযুক্তির উৎকর্ষের এই যুগেও তাঁর অপরিবর্তনীয় উসূলে কোন পরিবর্তন সাধিত হয়নি; বরং তীর-তরবারির যমানার মতো এখনও আল্লাহ তাআালার সাহায্য মু'মিনদেরকে নিরাপদ রাখছে। ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতেও এর ধারা অব্যাহত থাকবে। তবে শর্ত হল তাঁরা এমন কিছু থেকে বিরত থাকবে যা আল্লাহ তাআলাকে অসন্তুষ্ট করে। সাথে সাথে নিজেদের নেক আমালের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার সাহায্যের ধারা অব্যাহত রাখবে।

বদরের পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি হলে আজও ফেরেশ্‌তা আমাদের সাহায্যের জন্য দলে দলে নেমে আসবে। ইনশাআল্লাহ!

ঝঞ্ঝাবায়ু কর্তৃক মুজাহিদদের সাহায্য করা

ইসলামাবাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষাকারী আমার এক ভাই স্বয়ং নিজে আমাকে এই ঘটনা শুনিয়েছেন যে, তিনি নিজে দশজন মুজাহিদসহ (যাদের মধ্যে তিনজন ছিলেন মুহাজির বাকী সাতজন আনসার) ২০১১ সালের গ্রীষ্মকালে 'খাত্তায়ে মেহমুদ' অঞ্চলে একটি অপারেশনের উদ্দেশ্যে বের হন। তাঁদের টার্গেট ছিলো 'আসমানে মুনাযযাহ' নামক এলাকায়পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি চৌকি। পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছে মুজাহিদ ভাইগণ পাহাড়ে আরোহণের জন্য কোন রাস্তা অবলম্বন করা যায় এই নিয়ে পরস্পরে পরামর্শ আরম্ভ করলেন। যদি শত্রুদের চোখ ফাঁকি দিয়ে নিরাপদ রাস্তা অবলস্বন করা হয় তাহলে তা এতো দীর্ঘ, দুর্গম এবং বন্ধুর যে পাহাড়ে আরোহণ করতে করতেই শরীরের সমস্ত শক্তি ব্যয় হয়ে যাবে তখন উপরে পৌঁছে লড়াই করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। পক্ষান্তরে সংক্ষিপ্ত পথটি ছিলো একেবারে শত্রুদের চোখের সামনে। ফলে প্রবল আশংকা ছিলো যে, যদি সেই রাস্তা অবলম্বন করা হয় তাহলে মুজাহিদীনদেরকে পহাড়ে আরোহণ করতে দেখে চূড়ায় পৌঁছে পজিশন নেওয়ার পূর্বেই শত্রুরা উপর থেকে ফায়ার করা শুরু করবে।

মুজাহিদগণ এই সিদ্ধান্তহীনতা এবং দ্বিধা-সংকোচের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিলেন। ইতিমধ্যে বাতাসের সাথে ধোঁয়া এসে পুরো পাহাড়কে ছেঁয়ে ফেললো। ধোঁয়া এতটাই ঘন ছিলো যে, নিজের কয়েক কদম সামনেও দেখা কঠিন হয়ে পড়ল। মুজাহিদগণ এটাকে গায়েবী সাহায্য মনে করে সংক্ষিপ্ত রাস্তা দিয়েই পাহাড়ে আরোহণ করতে লাগলেন।

অতঃপর মুজাহিদগণ পাহাড়ের চূড়ায় শত্রু ছাউনির দোরগোড়ায় পৌঁছে সকলে নিজ নিজ পজিশন নিয়ে নিলেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই (আলহামদুলিল্লাহ) মুজাহিদগণ অত্যন্ত ধীরস্থিরভাবে অপারেশন সম্পন্ন করলেন দুশমনদের ছাউনির ওপর হাল্কা ও ভারী সব ধরনের অস্ত্রের মাধ্যমে। অপারেশন শেষ হওয়ার সাথে সাথেই পুনরায় ধোঁয়া এসে পুরো পাহাড় আচ্ছাদিত হয়ে গেল। মুজাহিদ ভাইগণ আরও একবার আল্লাহর প্রশংসা করতে করতে এর সদ্ব্যবহার করলেন এবং পাকিস্তানী সৈন্যদের চোখ ফাঁকি দিয়ে সংক্ষিপ্ত রাস্তা দিয়েই নিচে নেমে আসলেন। এবং কোন ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হওয়া ছাড়াই সফলভাবে দুশমনদের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করতে সক্ষম হলেন। সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্যই।

একজন আফগানী আলেমের ঈমানদীপ্ত কাহিনী

এক আফগানী মুজাহিদ আলেম ও খতিব। তিনি জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর তিনি আমাকে তার সাথে ঘটে যাওয়া ঈমানদীপ্ত এই ঘটনাটি শুনিয়েছেন। ২০০৯ সালে দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের 'আনা' এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। তিনি তাঁর বন্ধুর সাথে নিজ গাড়িতে চড়ে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে সামনের দিক থেকে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর একটি গ্রুপকে আসতে দেখলেন। তিনি গাড়ি সড়ক থেকে একটু



দূরে সরিয়ে রেখে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর চলে যাওয়ার অপেক্ষা করতে লাগলেন। কিন্তু সেনারা এই গাড়ির ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে সামনে অগ্রসর হলো এবং চতুর্দিক থেকে গাড়িকে বেষ্টন করে ফেললো।

তিনি বলেন, 'কিছু সৈন্য পায়ে হেঁটে আমার গাড়ির কাছে এসে আমাকে নিচে নামতে বলল' আমি শক্তহাতে ক্লাশিনকোভ ধরে দৃঢ় সংকল্প করে ফেললাম যে, কিছুতেই ধরা দিবো না এবং গাড়ি থেকেও নামবো না। কিন্তু এক সেনা যখন বারবার আমাকে এই বলে নিশ্চয়তা দিচ্ছিলো যে, আপনাকে গ্রেফতার করা হবে না। আপনি নিচে নেমে শুধু আমাদের অফিসারের সাথে সাক্ষাৎ করুন তখন আমি তাদের কথা বিশ্বাস করলাম এবং ক্লাশিনকোভসহ গাড়ি থেকে নেমে আসলাম। ইচ্ছা এটাই ছিলো যে, যদি তারা বিশ্বাসঘাতকতা করে তাহলে লড়াই চালিয়ে যাবো। কিছুতেই গ্রেফতার হবো না।

গাড়ি থেকে নেমে সৈন্যদের দিকে তাকাতেই তাদের সকলের পিছনে জমকালো পোষাক পরিহিতা অনন্য সুন্দরী এক রমণীকে দেখতে পেলাম। দেহ স্বাভাবিকের চেয়ে বেশ বড় ছিলো। পোষাকের অবস্থা এই ছিল যে, এ ধরনের পোষাক ওয়াজিরিস্তান তো দূরের কথা দুনিয়ার অন্য কোথাও হয়ত প্রস্তুত হয়না। চেহারার সৌন্দর্যের ঝলকও ছিলো অস্বাভাবিক, আমি এই দৃশ্য দেখে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলাম। এরই মধ্যে এক সেনা আবার আমাকে পীড়াপীড়ি করে বলতে লাগল। আমরা আপনাকে গ্রেফতার করতে চাইনা আপনি এখানে বন্দুক রেখে আমাদের অফিসারের কাছে চলুন।

একদিকে সেনা সদস্যের পীড়াপীড়ি অন্যদিকে ঐ জান্নাতী রমণীর হাতছনি। আমি বুঝে ফেললাম যে, এখানে বাড়াবাড়ি এবং কড়াকড়ির ফল হবে শাহাদাত। আর এই সুন্দরী সম্ভবত কোন হুর হবেন যিনি আমাকে দৃঢ়পদ থাকতে উৎসাহ যোগাতে এসেছেন। কিন্তু এই সেনা কর্মকতা এতটা তোষামোদের সাথে বারবার বলতে লাগল যে, তার কথা আমার কাছে সঠিক মনে হতে লাগল। ফলে আমার মনে কিছুটা দুর্বলতা এসে গেল। আমি ভাবলাম যেহেতু লড়াই ছাড়াই মুক্তি পাওয়া যাচ্ছে, তাহলে অযথা ঝুকি নেওয়ার কী প্রয়োজন? তাই ক্লাশিনকোভ গাড়িতে রেখে দিলাম। ক্লাশিনকোভ রেখে যখন এদিকে ফিরলাম দেখি সেই সুন্দরী উধাও। তখন আমি খুব আফসোস করলাম এবং নিজ কৃতকর্মের উপর লজ্জিত হলাম। বুঝে ফেললাম সিদ্ধান্ত নিতে ভুল করে ফেলেছি। আর বাস্তবেও হলো তাই। সেনারা বিশ্বাসঘাতকতা করল। তিনি সেনাবহরের নিকট পৌঁছতেই তারা তাঁকে গ্রেফতার করে ফেললো। গ্রেফতারীর পর তাঁকে কিছুদিন "ওয়ানা" সেনাক্যাম্পে রাখা হলো। অতঃপর পেশোওয়ারে "আই এস আই" এর গোপন জেলখানায় চালান করে দিলো।

জেলের মধ্যে তাকে বিবস্ত্র করে অত্যন্ত ন্যাক্কারজনক কঠিন শাস্তির মুখোমুখি করা হল। উল্টো করে লটকিয়ে পানিতে চুবানো হল। লোহার ডাণ্ডা দিয়ে পেটানো হল। এবং দাড়ির অপমান করা হল। মোটকথা তিনি আলেম হওয়ার দরুণ তাঁর সাথে আরো বেশি ঘৃণ্য আচরণ করা হয়। শাস্তির যে পর্যায়টি সবচেয়ে কষ্টদায়ক ছিল, তা হল তাঁকে একটি সংকীর্ণ অন্ধকার কামরায় ফেলে আসা হল। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি বুঝতে পারলেন যে, তাঁর শরীরে কিছু একটা বেয়ে ওঠছে। এভাবে থাকতে থাকতে যখন অন্ধকার একরকম গা সওয়া হয়ে গেল। এরই মধ্যে তিনি লক্ষ্য করলেন যে, ছোট্ট যে কামরাটিতে তাকে রাখা হয়েছিল এর মেঝেতে হাজার হাজার লাল বিচ্ছু তাঁর সাথেই বসবাস করছে। এগুলোর সংখ্যা দিন দিন বাড়তে লাগলো আর সবসময়ই এগুলো তাঁর শরীরে বেয়ে বেয়ে ওঠত। শুধু এতটুকুই না; বরং অবস্থা ছিল আরো করুন! তার এই ছোট্ট কামরাটিতে আকারে বিড়ালের মত বড় বড় ইঁদুরও বসবাস করতো যেগুলো তাঁর শরীরের বিভিন্ন অংশে দংশন করতো। ভয়ংকর এসব অবস্থা দেখে তার চিৎকারের আওয়াজ বাহির পর্যন্ত পৌঁছে যেত। তিনি জোরে জোরে জেলারকে ডাকতেন, কিন্তু পাষানদিল জেলার তাঁর ডাকে কোন সাড়া দিতনা। তিনি আল্লাহর দিকে পরিপূর্ণভাবে ধাবিত হলেন এবং আল্লাহর যিকির করতে লাগলেন। যতক্ষণ যিকির করতে থাকতেন শরীরের অনুভূতি এমন হত যেন শুধু কোন ইঁদুর কাটছে বা কাপড় ছিড়া হচ্ছে। মাথায় ব্যথার কোন অনুভূতিই হত না এবং যখনই এই পোকা-মাকড়কে দেখে ঘাবড়ে যেতেন এবং যিকির বন্ধ করে চিৎকার করতেন, তখনই কষ্ট অনুভব হওয়া শুরু হয়ে যেত। পরিশেষে আল্লাহর যিকিরকেই আশ্রয়স্থল হিসেবে বেছে নিতেন। ফলে এ সব কষ্ট সহ্য করা সহজ হয়ে যেত। এরচেয়েও বিস্ময়কর যে কথাটা ভাই বললেন, তা হল যখন নামায পড়তে যেতেন এবং সেজদায় যেতেন তখন সেখানের বিচ্ছু এবং ইঁদুরগুলো ঢেউয়ের মত ডানে বামে সরে যেত। তার জন্য জমিনে কপাল রাখার জায়গা করে দিত। অতপর যখন তিনি সেজদা থেকে উঠে বসতেন তখন পোকামাকড়গুলো পুনরায় চলে আসতো। এই ভাই বললেছিলেন যে, জীব-জানোয়ার এবং কীটপতাঙ্গগুলোকে একজন দুর্বল মুজাহিদ বান্দার জন্য নিযুক্ত করে রাখতে দেখে আমার বড় আসার সঞ্চার হল এবং এই বিশ্বাস আরো দৃঢ় হল যে, আমরা হকের উপর আছি। আর আল্লাহর সাহায্য এবং সৃষ্টিকুলের সহানুভূতি আমাদেরই সাথে।

আমেরিকানদের কারা প্রকোষ্ঠে মহা সুসংবাদ

আমাকে শায়খ আবু ইয়াহইয়া লিব্বী রহ. নিজেই এ ঘটনা শুনিয়েছেন যে, যখন তাঁকে করাচী থেকে বন্দী করে আফগানিস্তানের বাগরাম জেলখানায় নিয়ে যাওয়া হয়, তখন প্রথম কয়েক মাস অত্যন্ত কঠিন অতিক্রান্ত ছিল। সাধারণত প্রথম মাসগুলোতে জিজ্ঞাসাবাদ ও কঠোরতা অধিক পরিমাণেই হয়ে থাকে, ফলে জেলখানার ভয়াবহতায় বন্দীরাও নিরাশ হয়ে পড়েন। তাই এ মাসগুলোতে বেশী ধৈর্য্যধারণ করতে হয় এবং

আল্লাহ তাআলার বিশেষ অনুগ্রহের ফলেই মাসগুলো সহজে পার হয়। শায়খ বলেন, আনুমানিক সেটি আমেরিকানদের জেলে চতুর্থ মাস ছিল, কয়েদখানার এক সংকীর্ণ ও অন্ধকারাচ্ছন্ন কুঠরীতে রাত-দিন অতিবাহিত হচ্ছিল, দয়াময় প্রভু ছাড়া আর কারো ওপর ভরসা ছিলনা। হঠাৎ এক রাতে প্রশান্তিদায়ক এমন এক স্বপ্ন দেখতে পাই, যা সকল প্রকার চিন্তা-পেরেশানী দূর করে দেয় সাথে সাথে আল্লাহ তাআলার সাহায্য ও নৈকট্যের অনুভূতি আমার দুর্বল চিত্তকে পাহাড়ের ন্যায় অটল করে দিয়েছে। শায়েখ বলেন, আমি দেখতে পেলাম যে, আমি এক মসজিদে প্রবেশ করলাম যেখানে "জুমার" নামাযের পর দরস অনুষ্ঠিত হয়। তো সেখানে আরবের প্রসিদ্ধ এক অন্ধ আলেমে রব্বানী শায়েখ মাহমুদ বিন উকালা আস্ সায়ীবী রহ. দাঁড়িয়ে দরস দিচ্ছিলেন, তিনি মুজাহিদীনদের কষ্ট ও পরীক্ষাসমূহের কথা উল্লেখ করে তাদেরকে লক্ষ্য করে শান্তনাপূর্ণ কথাবার্তা বলছিলেন। শায়েখ বলেন, যে, আমি শায়েখ মাহমুদ বিন উকালার কথা শুনতে শুনতে মসজিদ থেকে বের হয়ে আসছিলাম তখন আমার মনে হচ্ছিল যে, ঐ আওয়াজ যা প্রথম মসজিদ থেকে আসছিল এখন তা স্থানান্তরিত হয়ে আসমান থেকে আসছে। আসমান থেকে সুস্পষ্ট আওয়াজ আসছিল "ধৈর্য্য ধারণ কর কেননা তোমরা আল্লাহর সাহায্যপ্রাপ্ত লোক!" শায়েখ বলেন যে, আমি সামনে অগ্রসর হচ্ছিলাম আর সেই আওয়াজও বারবার পুনরাবৃত্তি হচ্ছিল, এক পর্যায়ে আমি দেখলাম যে, আমি লিবিয়ায় অবস্থিত আমার বাড়িতে প্রবেশ করে সেখানকার গোসলখানার দিকে অগ্রসর হচ্ছি ও তার বন্ধ দরজা খুলছি। তখন দেখতে পেলাম যে, শায়েখ মাহমুদ বিন উকালা পূর্ব থেকেই সেখানে উপস্থিত রয়েছেন এবং পোষাক গায়ে রেখেই গোসল করছেন, শায়েখ মুচকি হেসে আমার দিকে তাকালেন। আমি একটু লজ্জাবোধ করলাম এবং দরজা বন্ধ করে দিলাম। দরজা বন্ধ করতেই আওয়াজ এলো যে, "হয়তবা মুজাহিদীনরা চিন্তিত-"

আমি বুঝতে পারছিলাম না যে, এই আওয়াজ শায়েখ মাহমুদ দিয়েছেন নাকি আসমান থেকে আসছে, কিন্তু দেখা গেল তার পরবর্তী আওয়াজ সুস্পষ্ট আসমান থেকেই আসছে। এতে বলা হচ্ছে যে, মুজাহিদীনদের সন্তুষ্ট করার জন্য এ কথাটি কী যথেষ্ট নয় যে, আমি তাদের ওপর সন্তুষ্ট হয়ে গেছি। আর কখনো অসন্তুষ্ট হবনা!! তারা আমার কাছে যা কিছু চাইবে, আমি তাদেরকে তা দেব অর্থাৎ বিজয় এবং আরো অনেক কিছু। স্বপ্নের এ সকল সুসংবাদ জেলখানার সকল ভাইদের হিম্মত আরো বাড়িয়ে দিয়েছে আর হৃদয়ে প্রশান্তি ও দৃঢ়তা দান করেছে, সাথে সাথে একথাও সুস্পষ্ট করে দিয়েছে যে, ইসলামের দুশমনরা শুধুমাত্র মুজাহিদীনের দেহটাকেই বন্দী করতে পারে; কিন্তু তাদের অন্তর, চিন্তা-চেতনা ও হৃদয়কে আকাশে বিচরণ করা এবং প্রভূর সাথে গোপনে কথা বলা ও প্রার্থনা করার ব্যাপারে বাঁধা দিতে পারেনা।

এক আহত সাথীর উপর আল্লাহর অশেষ রহমত

২০০৮ সালে "ওয়ানা" এলাকার কালুশাহ নামক স্থানে মুজাহিদীনদের একটি কেন্দ্রে ড্রোন হামলা হয়। এতে ছয়জন আফগানী ও দুজন পাকিস্তানী শাহাদাত বরণ করেন আরও কয়েকজন সাথী আহত হন। ইয়াসীন ভাই যিনি পাঞ্জাবের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতেন, তিনিও এই আহতদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁর পায়ের নলা ও কোমড়ের হাড় ভেঙ্গে গিয়েছিল। ফলে পায়ে সামান্য স্পর্শ লাগাটাও এত অসহনীয় কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে, তার চিৎকারে পুরো হাসপাতাল প্রকম্পিত হয়ে উঠত। আমি ভাবতাম যে, যদি এই ভাইয়ের প্রাকৃতিক হাজত পূরণের প্রয়োজন হয় তাহলে কিভাবে তিনি হাজত পুরা করবেন? কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত সে ভাইয়ের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করলেন, প্রায় দুসপ্তাহ যাবৎ তিনি সর্বপ্রকার খাবার খেয়েছেন এবং পেটভরে তিন বেলাই আহার করেছেন, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল- একবারের জন্যও তাঁর ইস্তেঞ্জার প্রয়োজন হয়নি এবং এতে পেটেও কোনরূপ কষ্ট অনুভব হয়নি। এভাবেই সে ভাই কষ্টের প্রথম দু'সপ্তাহ খেয়ে দেয়ে আরামে বিছানায় কাটিয়েছেন। কিন্তু যখন পায়ের জখম কিছুটা ভালো হচ্ছিল আর কষ্টও কিছুটা লাঘব হচ্ছিল তখন ঠিকই পূর্বের অবস্থা ফিরে এলো। (অর্থাৎ ইস্তেঞ্জার প্রয়োজন স্বাভাবিকভাবেই দেখা দিল)।

সবুজ পাখির অন্তরে



স্বাধীনতা তোমার হৃদয়ে...

-অবুঝ বালক

স্বাধীনতা চার দেয়ালের কল্পিত স্বর্গে নয়। স্বর্গের কি দেয়াল থাকে? আকাশ দেখেছ, বিশাল আকাশ? উড়তে পারবে ডানা মেলে? স্বাধীনতা ঐ আকাশেও নেই। ঐ যে গলায় ফাঁস লাগিয়ে সিলিং ফ্যানে ঝুলে পড়া মেয়েটি, ভেবেছে স্বাধীন হয়ে গেছে, ভেবেছে এই নরকের কষ্ট ছেড়ে হাটি হাটি পা পা করে স্বর্গে গিয়ে পৌঁছবে। কি বোকাই না এরা। সম্পদ, প্রাচুর্য, বিলাসিতা, তোমায় কি স্বাধীনতা এনে দেবে? ছুটে দেখ! শুধু ছুটতেই থাকবে, ছুটতেই থাকবে। ছুটতে ছুটতে একদিন কবরে গিয়ে পৌঁছবে, পচে গলে যাবে। স্বাধীনতা পাবে না......

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহিমাহুল্লাহ) কে তার পুত্র জিজ্ঞেস করেছিল, ‘আমরা শান্তি পাব কবে?’ জবাবে ইমাম আহমদ বলেছিলেন, ‘জান্নাতে আমাদের প্রথম কদম রাখার পর থেকে’

সুতরাং তোমার ভয় কিসের? ইসলামের শত্রুরা তোমার কী করবে? তোমাকে অপমান করবে? তাড়িয়ে দেবে? তোমাকে নিঃস্ব করে দিবে? ক্ষত বিক্ষত করবে তোমার শরীর? বন্দী করে রাখবে আমৃত্যু? হত্যা করবে তোমার প্রিয়জনদের? হত্যা করবে তোমাকে? কিন্তু একটা জায়গায় তারা কোনদিন পৌঁছুতে পারবে না- তোমার হৃদয়ে। তারা কোনদিন তোমার হৃদয় ভেঙে চুরমার করে দিতে পারবে না, তোমার আগলে রাখা স্বপ্নকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না। তোমার রব, তোমার রবের সাথে তোমার সওদা, তোমার রবের ভালোবাসা, কেমন সে ভালোবাসা? কতখানি? কোনদিন জানতে পারবে না। তাই যতক্ষণ তোমার এই হৃদয় তোমার রবের সাথে আছে, ততক্ষণ তুমি কিছুই হারাওনি। তোমার কোন ক্ষতি কেউ করতে পারেনি। শেকলে বেঁধে কোনদিনই তারা তোমার স্বাধীনতা কেড়ে নিতে পারেনি। চোখ বন্ধ করলেই যে যোগাযোগটা হয় সেটাই তোমার স্বাধীনতা। সুবহানাল্লাহ!

আপনার জিজ্ঞাসা ও আমাদের জবাব



প্রশ্নঃ গণতন্ত্র কেন কুফুরী?



উত্তর: গণতন্ত্র কুফুরী হওয়ার অনেকগুলো কারণ রয়েছে। নিম্নে কিছু বর্ণনা দেয়া হলো,

১. গণতন্ত্রে ওহীর ওপর মানব জ্ঞান বুদ্ধিকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে, গণতন্ত্রে মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধিকে ওহীর চেয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। গণতন্ত্রের আইনে ওহী ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য নয় যতক্ষণ পর্যন্ত না মানব জ্ঞান (পার্লামেন্ট সদস্যরা) তার স্বীকৃতি দেয়। এ রকম কাজকে উম্মতের ফক্বীহগণ স্পষ্ট কুফুর বলেছেন। বরং গণতন্ত্র তো এর চেয়েও আগে বেড়ে মানুষের ইচ্ছা-চাহিদাকে পর্যন্ত ওহীর ওপর অগ্রাধিকার দেয়। এমন কাজও কি কুফুরী হওয়ার ব্যাপারে কারো সন্দেহ থাকতে পারে? আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানও ততক্ষণ পর্যন্ত আমলযোগ্য নয় যতক্ষণ পর্যন্ত না পার্লামেন্ট সদস্যরা তা গ্রহণ করে। নিঃসন্দেহে এটি এমন কুফুরি যা ব্যক্তিকে মিল্লাতে ইসলাম থেকে বের করে দেয়।

উদাহরণস্বরূপ, আল্লাহ্ তাআলা বিবাহিত যিনাকারী নারী-পুরুষের শাস্তির আইন স্বীয় পবিত্র গ্রন্থে শেষ রাসূলের ওপরে নাযিল করেছেন এবং এটিকেই উম্মতের কানূন হিসাবে স্থীর করেছেন। কিন্তু এই গণতন্ত্রের আইনে আল্লাহর তৈরী এই আইনও পার্লামেন্টের মঞ্জুরী ব্যতীত আমলের উপযুক্ত মনে করা হয় না। এর দ্বারা একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে যদি কোন আইন ইসলাম অনুযায়ী তৈরীও করা হয়। তাহলে তা এই ভিত্তিতে পালনীয় হয় না যে, তা আল্লাহর তৈরি আইন; বরং তা এজন্য মেনে নেওয়া হয় যে, তাকে গণতন্ত্রের সংসদ সদস্যরা সংবিধানসম্মত মনে করেছে। অন্যথায় আল্লাহর আদেশই যদি যথেষ্ট হত তাহলে পার্লামেন্টে বিল পাশের প্রয়োজন হত না। আহকামুল হাকেমীন আল্লাহ তাআলা যে আইন তার প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর নাযিল করেছেন তা বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নেওয়া হত। কুরআনে কারীমে এ মন্দচারিতাকে আল্লাহ তাআলা এভাবে ব্যক্ত করেন,

﴿ ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ ﴾

অর্থ: “(সর্বদা জাহান্নামে থাকা তোমাদের এই অবস্থা) এজন্য যে, যখন শুধু এক আল্লাহর দাওয়াত দেয়া হতো, তখন তোমরা অস্বীকার করতে। আর যদি আল্লাহ তাআলার শরীক সাব্যস্ত করা হতো তখন তোমরা তা মেনে নিতে। সুতরাং জেনে রাখো সকল হুকুম কেবল একমাত্র আল্লাহর জন্য যিনি মহান।” (সূরা গাফির, আয়াত ১২)

গণতন্ত্রের কুফুরী এমন যে, এখানে আল্লাহর শরীয়তকে শুধু আল্লাহর জেনে মানা হয় না; বরং আল্লাহর সাথে পার্লামেন্ট সদস্যদেরকে শরীক বানিয়েই আল্লাহর শরীয়তকে মেনে নেয়া হয়। এখন সত্যবাদী আলেমগণ বলুন যে, এই বাস্তবতা জেনে আল্লাহর শরীয়তকে মঞ্জুরীর জন্য মানুষের সামনে পেশ করা কেমন হবে?

এছাড়া এ বিষয়টিও উপলব্ধিতে আনা প্রয়োজন যে, যদি কোন পার্লামেন্টে শতভাগ দ্বীনদার এবং শরীয়ত অনুসারী লোকেরা বসে থাকার পরও আল্লাহর শরীয়তকে ততক্ষণ পর্যন্ত সংবিধানের অংশ বানানো যায় না যতক্ষণ না পার্লামেন্টে তা মঞ্জুর করা হয়।

তাহলে এমন পার্লামেন্টের হুকুম ও কি ভিন্ন কিছু হবে না? যদি কোন ব্যক্তি একথা বলে যে, জিহাদ ছাড়াই আল্লাহর শরীয়তকে সংবিধানের অংশ করা যাবে। তাহলে তার উপলব্ধি মূলত গণতন্ত্রের পরিচয়, তার স্বভাব-প্রকৃতি, তার নিয়ন্ত্রণকারী ও তার প্রকৃত রক্ষকদের না চেনারই প্রমাণ। মূলত এ ধরনের লোকেরা গণতন্ত্রকে বোঝে না এবং তারা পুরোপুরি ধোঁকার মধ্যে রয়েছে। গণতন্ত্রকে তখন পর্যন্ত গণতন্ত্র বলা যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত অন্যসব কিছুর ওপর মানব জ্ঞানের অগ্রাধিকার প্রমাণিত না হয়। যদিও তা সেই ওহীই হোক না কেন যাকে ফেরেশতাদের সরদার বহন করে নবীদের সরদার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন।

২. গণতান্ত্রিক শরীয়তের মধ্যে প্রবৃত্তির খায়েশকেই মা'বুদ সাব্যস্ত করা হয়। গণতন্ত্রের মধ্যে জীবন-বিধান এবং জীবনব্যবস্থা (আইন) তৈরী করা পার্লামেন্টের অধিকার। ওরা নিজেদের খায়েশ অনুযায়ী যা চায় তাকেই আইন এবং সংবিধানে স্থান দেয়। অথচ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীয়তের মধ্যে এই অধিকার একমাত্র আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কারোর নেই। সুতরাং এরকম বিশ্বাস রাখা আল্লাহর সাথে কুফুরী বৈ কিছু নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾

অর্থ ঃ "তবে কি তাদের এমন শরীক রয়েছে যারা তাদের জীবনব্যবস্থা তৈরী করে। যে বিষয়ে আল্লাহর অনুমতি নেই।" (সূরা শুআরা, আয়াত ২১)

৩. এই গণতন্ত্র আল্লাহ তাআলার আইন প্রণয়নের গুণ "الأمر" তথা হুকুম ও কানুন আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য (পার্লামেন্ট) সাব্যস্ত করে। আর এটিই গণতন্ত্রের রূহ বা আত্মা। কেউ যদি গণতন্ত্রের মধ্যে থেকে এ কথা বলে যে, আইন প্রণয়ন কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী হতে হবে তাহলে এটি হবে শুধু মুখের বুলি। কেননা গণতন্ত্র কোন প্রকারের ওহীর আনুগত্যকে গ্রহণ করে না। এর স্পষ্ট প্রমাণ হল পার্লামেন্টে শরীয়ত পরিপন্থী আইন প্রণয়ন। পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যরা যে বস্তুর বৈধতা দেবে তা বৈধ, যদিও তা শরীয়ত কর্তৃক নিষিদ্ধ সুদ, যিনা, মদের মতো অভিশপ্ত বস্তুই হোক না কেন? অথবা আল্লাহ তাআলার দণ্ডবিধিই হোক না কেন যা রহিত করা তো দূরের কথা এতে সামান্য পরিবর্তন করারও অবকাশ নেই।

এমনিভাবে পার্লামেন্ট যা অবৈধ বলবে তা অবৈধ, যদিও তা জিহাদের মতো মহান ইবাদত হোক না কেন। পার্লামেন্টের বানানো সংবিধানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, তাকে পবিত্র জ্ঞান করা, তার অনুসরণ করা প্রত্যেক সংসদ সদস্যের ওপর ফরজ। একে অবৈধ জ্ঞানকারী সংবিধানের বিদ্রোহী বলে গণ্য হবে। এখন যদি কেউ এই সংবিধান ছেড়ে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সংবিধান অনুযায়ী বিচার মীমাংসা করে। অথবা করানোর চেষ্টা করে, তাহলে সে গণতন্ত্রের রিটকে চ্যালেঞ্জকারী বলে গণ্য হবে। সরকার তাকে রাষ্ট্রদ্রোহী সাব্যস্ত করে তার বিরুদ্ধে পদাতিক বাহিনী থেকে শুরু করে বিমান বাহিনী পর্যন্ত ব্যবহার করাকে বৈধ বলে মনে করে। এরকম বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা তাদের প্রাণ নাশ করা, তাদের অর্থ-সম্পদ লুট করা এবং এর জন্য নিজেদের জীবন বিলিয়ে দেওয়া তাদের জন্য ফরজ হয়ে যায়। এ কারণেই প্রায় তাদের একথা বলতে শোনা যায় যে, আমরা সংবিধানের আওতায় থেকে ইসলামী শরীয়ত বাস্তবায়নের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করব। অথচ সংবিধানের সীমানা সেটিই যা গণতন্ত্র নির্ধারণ করেছে অর্থাৎ যে কোন বিধান (যদিও তা আল্লাহ তাআলারই হোক না কেন) ততক্ষণ পর্যন্ত গণতান্ত্রিক ধারায় সংবিধানের অংশ হতে পারে না যতক্ষণ না এর অনুমোদন পার্লামেন্ট দিবে। যার অর্থ হল এখানে আল্লাহর আদেশ চলবে না, চলবে মানবরচিত আদেশ।

৪. এই পার্লামেন্টে অনুমোদিত জীবন বিধানকে মানুষের জন্য বাস্তবায়ন করা, মানুষদেরকে এর নিয়মানুবর্তী করা, পুলিশ, সেনাবাহিনী, বিচার বিভাগ ও অন্যান্য প্রশাসনিক বিভাগ থেকে এর উপর আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করা এবং এর জন্য কাজ করার আকীদা ও চিন্তাধারা লালন করা মুহাম্মাদ সা. এর আনীত শরীয়তের সুস্পষ্ট অস্বীকারের নামান্তর।

৫. গণতন্ত্রের শরীয়তে কাফের এবং মুসলমানের মর্যাদা সমান। অথচ একথার ওপর উম্মতের ইজমা রয়েছে এবং কুরআনে কারীমের মধ্যে একাধিক জায়গায় একথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে যে, মুসলমান এবং কাফের কখনো এক হতে পারে না।

৬. গণতন্ত্রে রাষ্ট্রপ্রধান এবং নির্দিষ্ট কিছু পদের অধিকারীরা পরিপূর্ণভাবে আইনের উর্ধ্বে। তাদেরকে ইসলামি আইনের উর্ধ্বেও মনে করা হয়। প্রশ্ন হল: যদি আপনাদের আইন ইসলামী আইন হয়ে থাকে তাহলে নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তিবর্গ আইনের উর্ধ্বে হয় কী করে? শরীয়তের দণ্ডবিধি আরোপ হলেও তাদের ক্ষেত্রে কার্যকর করা হয় না। অথচ ইসলামী শরীয়তে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুণ্যবতী কন্যাদের ব্যাপারেও কোন ছাড় নেই। গণতান্ত্রিক এই চিন্তাধারাও উম্মতের ইজমা পরিপন্থী।

৭. যদি কোন রাষ্ট্রের ৯৯% আইন ইসলামসম্মত আর শুধু একটি ধারা অনৈসলামিক হয় এবং তা নিয়মতান্ত্রিকভাবে সংবিধানের অংশ হয়, তবুও ইসলামী শরীয়ত এই শিরিককে গ্রহণ করে না। সুতরাং এ ধরণের আইনকে ইসলামী বলা যায় না, বরং তাকে কুফুরীই বলা হবে। এজন্য যদি কোন মুসলমান এই সংবিধানকে জীবনবিধান হিসাবে গ্রহণ করে এবং তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশকে আবশ্যক মনে করে তাহলে তা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লামের আনীত দ্বীনকে প্রত্যাখ্যানের নামান্তর হবে। কেননা সে এমন বিষয়কে মানুষের জন্য আবশ্যক মনে করেছে যা আল্লাহ তাআলা আবশ্যক মনে করেননি।

৮. মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীয়তে কোন কাফের মুসলমানদের জজ, বিচারক বা অফিসার হতে পারে না। এমনকি ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে কর আদায়কারী যিম্মী কাফেরও যদি অফিসার হয়ে যায় তাহলে সে যিম্মী থাকবে না তাকে হত্যা করা জায়েয হয়ে যাবে। আবু বকর আল জাসসাস রহ. তাঁর আহকামুল কুরআন গ্রন্থে এমনই বলেছেন। কিন্তু গণতন্ত্রের আইনে হিন্দু, শিখ, খ্রিষ্টান এবং যে কোন কাফের মুসলমানদের বিচারক বা অফিসার হতে পারে।

৯. গণতান্ত্রিক পার্লামেন্টের বিধান অনুযায়ী মহিলা রাষ্ট্রপ্রধান হতে পারবে এ নীতিও উম্মাহর ইজমা পরিপন্থী।

১০. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইহুদীরা বিভিন্ন বিষয়ে ফতওয়া জিজ্ঞাসা করত যে, আপনার শরীয়তে এর হুকুম কী? অতঃপর যদি তা নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী হত তাহলে সে অনুযায়ী মীমাংসা গ্রহণের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসত আর যদি তা তাদের ইচ্ছার বিপরীত হত তাহলে তা তারা প্রত্যাখ্যান করত। আল্লাহ তাআলা তাদের এই কর্মকে

يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ....

তথা তাহরীফ বলে গণ্য করেছেন। বর্তমান গণতন্ত্রও যেহেতু এই ইহুদীদের তৈরী, সে জন্য তার মধ্যে ইহুদী স্বভাবের প্রতি পুরোপুরি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। ইসলামের যেই বিধান নিজেদের ইচ্ছার অনুগামী হবে তা মানুষের অনুমোদনের পর সংবিধানের অংশ বানানো হবে। যাতে ইসলামী মূল্যবোধে অনুপ্রাণিত লোকেরা এই কুফুরী ব্যবস্থাকে ইসলামী বলে মেনে নেয় এবং নিজেদের মনোবাঞ্ছনাও পূর্ণ হয়। আর যেখানে নিজেদের ইচ্ছা আল্লাহর আইনকে মেনে নেয় না সেখানে স্পষ্টভাবে অস্বীকার, জিদ, হিংসা অহংকার, অনীহা এবং বিভিন্ন প্রকারের বাহানার আশ্রয় নেওয়া হয়।





ইরাকে মুসলিম বন্দিনীদের নির্যাতনের ভয়াবহতা

রূপকথায় অন্ধকূপের কথা আমরা সবাই শুনেছি। কিন্তু এই বাস্তব পৃথিবীতেই কিছু অন্ধকূপ আছে, যেখানে বন্দি মুসলিম রাজকন্যারা। মুসলিম নারীদের আমরা রাজকন্যার মতই সম্মান করি, আগলে রাখি। এটি সেইসব রাজকন্যাদের দুঃসহ জীবনের করুণ গল্প। ইরাকে মুসলিম নারীদের গ্রেফতারের পর সাধারণত তিনটি জঘন্য পর্যায় অতিক্রম করতে হয়। অপমান, নির্যাতন এবং সর্বশেষ ধর্ষণ। 'আল-কাদিমিয়া' কারাগারের একজন দক্ষ সমাজকর্মী এবং তিনজন ন্যাশনাল গার্ডের বর্ণনা অনুসারে নির্যাতনের বিবরণ এরকম....

গ্রেফতার

নিরাপত্তা কর্মীদের রেইড এবং তল্লাশি অভিযানের মধ্য দিয়েই এই অত্যাচার শুরু হয়। সেকেন্ড বিগ্রেড টিম ৬ এর কমান্ডার মেজর জুমা আল মুসাবি, যার বিরুদ্ধে ক্রিমিনাল রেকর্ড থাকার পরও তাকে আমেরিকানরা এই পদে নিযুক্ত করে, তার নিজের ভাষায়, "ইন্টেলিজেন্স থেকে রেইড অর্ডার আসলে আমরা প্রথমেই মদ খেয়ে পার্টি করে নিতাম। সবচেয়ে নিষ্ঠুর সৈনিকদের বেছে নেয়া হতো এই অভিযানগুলোর জন্য। সর্বপ্রথম যে কাজটা আমরা করতাম তা হলো, বাড়ির পুরুষদের থেকে মহিলা আর শিশুদের আলাদা করে ফেলা। সোনা বা দামি কোন জিনিস থাকলে আমরা সেগুলো হাতিয়ে নিতাম। আমরা বাড়ির সবকিছু লণ্ডভণ্ড করে দিতাম। তারপর আমরা তল্লাশির নাম করে মহিলাদের গায়ের বিভিন্ন অংশে হাত দিয়ে মজা করতাম। কেউ আপত্তি করলে আমরা বাড়ির পুরুষদের ধরে নিয়ে যাওয়ার হুমকি দিতাম। কোন মহিলা যদি দেখতে সুন্দর হতো, আমরা সেখানেই তাকে ধর্ষণ করতাম আর অস্ত্রশস্ত্র না পেলে চলে আসতাম। কিন্তু যদি কোন অস্ত্র পাওয়া যেত, আমরা বাড়ির সব পুরুষদের গ্রেফতার করে নিয়ে আসতাম। কোন পুরুষ না থাকলে আমরা বাড়ির মহিলাদের গ্রেফতার করতাম। আমাদের উপর এরকমই নির্দেশ ছিল।" এ ধরনের জঘন্য অপকর্মের পর এসব নরকের কীটেরা অনুতপ্ত হওয়ার পরিবর্তে, কুকর্মের ঘটনা একে অন্যকে বলে বেড়াত।

আল মুসাবি এবং তার সহকারী লেফটেন্যান্ট রাফিদ আদ দাররাজি (আরেকজন ক্রিমিনাল যাকে মৃত্যুদন্ড দিয়ে আবু গারিব কারাগারে রাখা হয়েছিল কিন্তু আমেরিকানরা তাকে মুক্তি দিয়ে লেফটেন্যান্ট বানিয়ে দেয়) আরো একটি ঘটনা বর্ণনা করেন,

"২০০৬ সালের জুলাই মাসে আমরা কাররাদা শহরের একজন কাপড় ব্যবসায়ীর বাড়ি তল্লাশির নির্দেশ পাই। রাত ১ টায় আমরা তার বাড়িতে গিয়ে হাজির হই। কিন্তু তাকে পাওয়া যায়নি। বাড়িতে তার স্ত্রী আর ১৭ বছরের ছেলেকে পাওয়া যায়। তল্লাশি চালিয়ে আমরা একটি রাইফেল খুঁজে পাই। আইন অনুসারে নিরাপত্তার জন্য এ ধরনের অস্ত্র রাখা বৈধ ছিল। কিন্তু আমরা মহিলাকে হুমকি দিই যে, তাকে ধর্ষণ করতে না দিলে আমরা তার ছেলেকে ধরে নিয়ে যাব। ছেলেটিকে পাশের রুমে আটকে রেখে একের পর এক সৈনিক তাকে উপর্যুপরি ধর্ষণ করে। অন্যরা তখন বাড়িতে থাকা মূল্যবান জিনিসপত্র চুরি করে নিচ্ছিলো। এরপর আমরা 'আল দোরাতে' অবস্থিত 'উম্মে আলার' বিখ্যাত বেশ্যালয়ে বাকি রাতটুকু কাটিয়ে দিই।"

তাদের ভাষ্যমতে, "কোন মহিলাকে গ্রেফতারের পর আমাদের কাজ হলো নির্দিষ্ট জায়গায় তাকে পৌঁছে দেয়া। এ সময়ও গাড়িতে সৈনিকেরা তাকে উদ্দেশ্য করে অশ্লীল গালাগালি করতে থাকে এবং তার শরীরের এমন কোন জায়গা বাকি থাকে না যেখানে হাত দেয়া হয় না। ইনভেস্টিগেশন সেলে আগে তার হাত-পা আর চোখ বেঁধে ধর্ষণ করা হয়, এরপর প্রশ্ন করা হয় তাকে কেন ধরে আনা হয়েছে বা তার বক্তব্য কি!! তথ্য না দিলে এসব ছবি প্রকাশ করে দেয়ার হুমকি দেয়া হয়। সাধারণত হেডকোয়ার্টারে পাঠানো 'কেস' প্রক্রিয়াধীন

থাকাকালীন এক থেকে তিন মাস তাকে ঐ স্টেশনেই রাখা হয়। এই মাসগুলোতে বিগ্রেডে থাকা প্রত্যেক গোয়েন্দা এবং সৈনিক তাকে ধর্ষণ করে। পরবর্তীতে তাকে শাব স্টেডিয়ামের 'আত তাসফিরাত' কারাগার অথবা 'আল মুছানা' এয়ারপোর্ট কারাগারে পাঠানো হয়। ভাগ্য খারাপ থাকলে বন্দিকে বাগদাদ অপারেশন হেডকোয়ার্টারের নিচে থাকা গ্রিন জোনে চিফ কমান্ডার মেজর জেনারেল আদনান আল মুসাবির অফিসে পাঠানো হয়। আল মালিকির কারাগারগুলোর মধ্যে এটি হলো সবচেয়ে খারাপ এবং ভয়ংকর।"

আত তাসফিরাত কারাগার

এটি হলো বন্দি জীবনের দ্বিতীয় ধাপ। সরকারে থাকা কিছু বিকৃত মানসিকতার 'সাইকপ্যাথ' এই কারাগারগুলোর দায়িত্বে থাকে। আইন মন্ত্রণালয় নিযুক্ত এসব অফিসারদের ৪৫% হলো 'আল মাহদি' মিলিশিয়ার সদস্য। ৩০% বদর অর্গানাইজেশন এবং বাকি ২৫% হলো সরকারের মদদপুষ্ট অন্যান্য সন্ত্রাসী সংগঠনগুলোর সদস্য।

এই লোকগুলোকে নিঃসন্দেহে বর্বর আখ্যা দেয়া যায়। তারা নির্যাতন, অপমান, বঞ্চনা আর জাতিগত বা রাজনৈতিক বৈষম্যের ভয়ংকর সব পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকে। তারা ধর্ষণের ক্ষেত্রে নারী পুরুষ বাছ-বিচার করে না। অধিকাংশ নারী বন্দিদেরই কোন মামলা বা অভিযোগ ছাড়াই এক থেকে ছয় বছর পর্যন্ত আটকে রাখা হয়। আল তাসফিরাতে পুরুষ এবং মহিলা বন্দিদের উপর চালানো অমানবিক নির্মম নির্যাতনের উদাহরণ ভূরি ভূরি। প্রায়ই প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, চীফ কমান্ডারের অফিস এবং ইরানি অফিসাররা এই কারাগারগুলো পরিদর্শন করতে আসতো। তারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা বন্দিদের উপর নির্যাতন চালাতো। অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে অনেক বন্দির মৃত্যু ঘটে।

২০০৮-২০১২ পর্যন্ত 'আল তাসফিরাত' কারাগারে ২৫০ এরও বেশি বন্দির মৃত্যুর ঘটনা রেকর্ড করা হয়, যার মধ্যে ১৭ জন নারী ছিল। একই সময়ে 'আল মুছানায়' ১২৫ জনের মৃত্যু রেকর্ড করা হয়। শুধু আত তাসফিরাতেই যে অত্যাচার চালানো হতো তা নয়, আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়ের অধীনে থাকা সব কারাগারেই এ ধরনের নির্যাতন চলতো। বিশেষত 'আল কাদিমিয়া' কারাগার, কিশোর কারাগার, কুখ্যাত আবু গারিব কারাগার এবং আল মালিকির গুপ্ত বহু কারাগার- যেগুলোতে মৃত বন্দিদের কোন রেকর্ডই রাখা হয় না।

একদিকে যখন এসব নিরপরাধ নারী-পুরুষের ওপর অত্যাচার চালানো হয়, অপরদিকে তখন মন্ত্রী এবং ভিআইপিদের সুপারিশে কুখ্যাত দাগী আসামিদের ছেড়ে দেয়া হয়। এখানে শুধুমাত্র দুইজনের কথা তুলে ধরা হলো,

রাদিয়াহ কাদুম মুহসিন তিনি ছিলেন দাওয়া পার্টির একজন প্রভাবশালী মহিলা সদস্য। তাকে খোদ আল মালিকির নির্দেশে ছেড়ে দেয়া হয়। তার বিরুদ্ধে সর্ববৃহত্তম শিশুপাচারকারী দলকে নেতৃত্ব দেয়ার অভিযোগ ছিল। সাথে পতিতাবৃত্তিতে বাধ্য করা, কিছু অফিসার এবং সরকারি কর্মকর্তার সাথে শারীরিক সম্পর্ক গড়ে সেসব ছবি দিয়ে ব্লাকমেল করা। আরও ছিল মাদক পাচার এবং সরকারি দলিল পাচারের অভিযোগ।

আদনান আবদুজ জাহরা আল আরাযি

তিনি ছিলেন মাহদি মিলিশিয়ার নেতা এবং অপরাধের ক্ষেত্রে ইরাকি ইতিহাসের সবচেয়ে কুখ্যাত একটি গ্যাং এর প্রধান। ২০০৬ সালের গোষ্ঠীগত যুদ্ধে তার বাহিনীর হাতে নিহত হওয়া ৫০০০ মানুষের লাশ ইরানে পাচার করার সময় আমেরিকানরা তাকে গ্রেফতার করেছিল। এই লাশগুলো হিমশীতল গাড়িতে ইরানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো অঙ্গ বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে। তার বিরুদ্ধে আরও ছিল এন্টিক, বিস্ফোরক, অস্ত্র আর মাদক চোরাচালানের অভিযোগ।

বিচার

আসল ট্র্যাজেডি শুরু হয় আদালতে বিচার আরম্ভ হলে। গ্রেফতারের পর বন্দি যদি এখনও বেঁচে থাকে প্রহসনমূলক বিচার এবং কারাগারে থাকাকালীন নির্যাতনের ফলে শারীরিকভাবে আহত হয়ে দূর্বল এবং মানসিক দিক দিয়ে অসুস্থ পড়ে। তখন তাদের এই দুর্বলতার সদ্ব্যবহার করা হয়।

ঐ কারাগারগুলোতে বিভিন্ন অপরাধে বন্দি থাকা মহিলাদের কাজে লাগানো হয়, এসব নিরপরাধ বন্দিদের কাছ থেকে তাদের ব্যক্তিগত নানা তথ্য সংগ্রহ করত তাদের সার্বক্ষণিক নজরদারিতে রেখে, ভয়ভীতি দেখিয়ে এবং ব্লাকমেইলিং করে অনেক গোপনীয় তথ্য জেনে নিতো। এরপর ঐ তথ্যগুলোই এসব হতভাগ্য নারীদের বিরুদ্ধে মামলায় ব্যবহার করা হতো!!

নারী বন্দিদের উপর চালানো নির্যাতনের বিভিন্ন পদ্ধতি

১। শারীরিক এবং মানসিক অত্যাচার কারারক্ষীরা তাদের আমেরিকান এবং ইরানি সুপারভাইজারদের কাছ থেকে শেখা বিভিন্ন পদ্ধতি বন্দিদের উপর প্রয়োগ করতো। এসবের মধ্যে আছে,

* বন্দিদের দুই ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে কাপড় ছাড়া নগ্ন থাকতে বাধ্য করা এবং এই অবস্থায় তাদের অপমান করা।

* লাঠি দিয়ে তাদের মারধর করা বা পশ্চাৎদেশে লাথি দেয়া।

* শরীরের বিভিন্ন স্পর্শকাতর স্থানে ইলেকট্রিক শক দেয়া।

* সবধরনের যৌন উৎপীড়ন (এর বেশি কিছু লেখা সম্ভব নয়)।

* মধ্যরাতের পর গার্ড এবং কর্মচারিদের দ্বারা উপর্যুপরি ধর্ষণ, প্রিজন ম্যানেজারের উপস্থিতিতেই। কারণ অধিকাংশ সময় তার রুমেই এই নির্যাতন চালানো হতো।

এই জঘন্য লোকগুলো দিনের পর দিন এসব অত্যাচার চালিয়েই ক্ষান্ত ছিল না, তারা প্রতিরক্ষা বা অন্যান্য বিভাগের অফিসারদের কারাগারে এসে নির্যাতন চালানোর আমন্ত্রণ জানাতো!

এখানে ২০০৮ সালে আল কাদিমিয়া কারাগারে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা উল্লেখ করা হলো

গ্রীনজোনে আল মালিকির একটি গুপ্ত কারাগারে এ আল যাইদি নামের একজন প্রাক্তন পুলিশ কর্ণেল এবং বদর অর্গানাইজেশনের কর্মকর্তা বন্দি ছিলেন। আমেরিকানদের হাতে জর্ডান সীমান্তে তিনি তার স্ত্রীসহ ধরা পড়েছিলেন। তার স্ত্রীকে রাখা হয়েছিল আল কাদিমিয়ায়।

নতুন বছর উপলক্ষে কিছু গোয়েন্দা অফিসার মদ খেয়ে পার্টি করছিল। আল যাইদিকে তারা নিয়ে আসতে বলে। আল যাইদিকে উপস্থিত করা হলে একজন মাতাল অফিসার জানতে চায়, সে তার স্ত্রীর সাথে কথা বলবে নাকি। এরপর আল কাদিমিয়ার প্রিজন ম্যানেজারকে ফোন করে তাদের দুইজনকে কথা বলার সুযোগ দেয়া হয়। কথা শেষ হলে আল যাইদিকে ফেরত পাঠানো হয় এবং গোয়েন্দা অফিসার তার স্ত্রীকে বলে যে, তারা একটু পার্টি করতে চায়। অতএব সে এবং আরও পাঁচজন বন্দি যেন এক ঘণ্টার মধ্যে প্রস্তুত থাকে। প্রিজন ম্যানেজার তাদের জন্য একটি রুমের ব্যবস্থা করে দেয় এবং সারারাত ধরে তাদের ধর্ষণ করা হয়। ‘পার্টি’ করার সময় তারা বলতে থাকে, “আল মালিকি জিন্দাবাদ, বাগদাদের চোর, মিথ্যাবাদী, বেশ্যার দালাল জিন্দাবাদ”।

২। বঞ্চনা

বঞ্চনা শব্দটি আসলে এখানে হাস্যকর। কারণ বন্দিরা ন্যূন্যতম অধিকার থেকেও বঞ্চিত ছিল। যেমন

* পরিবারের সাথে দেখা কিংবা ফোন বা কোন ধরনের যোগাযোগ করা।
* স্বাস্থ্য সেবা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবহার্য সামগ্রী। ভ বৈধ আইনগত অধিকার এবং আইনজীবির নিয়োগ।
* কোন ধরনের ডিটারজেন্ট, জীবাণুনাশক এমনকি সূর্য্যের আলো!'
* কোন ধরনের অভিযোগ। অভিযোগ না করার জন্য হুমকি দেয়া হতো, যদি কেউ অভিযোগ করেই ফেলতো সেগুলো কোন পাত্তা পেত না।

৩। ব্ল্যাকমেলিং এবং ভীতি প্রদর্শন

নারী বন্দিদের প্রায়ই তাদের পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের গ্রেফতারের হুমকি দেয়া হতো। বাড়িতে একবার ফোন করার অনুমতির জন্য অনেক অর্থ ঘুষ দিয়ে বহু অনুনয় বিনয় করতে হতো। তবে কারো ঘুষ দেয়ার সামর্থ্য না থাকলে দেহ বিক্রয়ের অনুমতি ছিল! এগুলো কিছু বর্ণনামাত্র। শুধুমাত্র বাগদাদ শহরেই ৩০০০ হাজারের বেশি নারী বন্দি আছে। কারাগারগুলোর প্রকৃত যন্ত্রণা শুধু তারাই ভালো জানে।

তথ্যসূত্র : অনলাইন



মুসলিমাহ নারীর কাজ কোথায় বাইরে না ঘরে?

-আনিকা ওয়ারদা তুবা

মুসলিমাহ নারীদের কাজ "বাচ্চা জন্ম দেওয়া" এবং "স্বামীকে খুশি করা" বলতে শুনলেই আমাদের মুসলিমদের গায়ে যেন দাউদাউ করে আগুন জ্বলে যায়! কেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কি এটাই আমাদের প্রধান দায়িত্ব করে দেননি? আল্লাহর তাআলার ইবাদতের জন্য আমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। সত্যি কথা। কিন্তু একজন নারীর প্রধান দায়িত্ব কি??

যেই চারজন নারী জান্নাতের সর্বশ্রেষ্ঠ আসনে থাকবেন, যারা দুনিয়া ও আখিরাতে সবচেয়ে সম্মানিত, যাদের মর্যাদা পুরো পৃথিবীর সব নারীর মধ্যে সবচাইতে বেশি; তাঁরা এই অবস্থানে কেন আছেন??

কি করেছিলেন তাঁরা? কীভাবে আল্লাহর ইবাদত করেছেন যে তাদের মর্যাদা আল্লাহর কাছে এতোটা বেড়ে গেছে??

এই চারজনের প্রত্যেকেই তাদের মা এবং স্ত্রী হবার কর্তব্য পালনের মধ্য দিয়েই এই মর্যাদার উপযোগী হয়েছেন।

মারইয়াম আ. হলেন সেরাদের সেরা। তিনি সমগ্র বিশ্বের নারীদের মাঝে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী। তাকে নিয়ে কুর'আনে বলা হয়েছে -

"হে মারইয়াম, আল্লাহ তোমাকে পছন্দ করেছেন এবং তোমাকে পবিত্র পরিচ্ছন্ন করে দিয়েছেন। আর তোমাকে বিশ্ব নারী সমাজের উর্ধ্বে মনোনীত করেছেন।" [সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৪২]

এই মারইয়াম, আল্লাহর কাছে তাঁর সম্মান পেয়েছেন ঈসা আ. এর মা হবার কারণে। একজন মা হওয়া অনেক বড় ব্যাপার। মা হবার কষ্ট, ধৈর্য্য, সন্তান লালন-পালন এবং সুসন্তান হিসেবে গড়ে তোলা বিশাল ব্যাপার, বিশাল! এই প্রতিটা কাজ আল্লাহর ইবাদতের অংশ। আর এভাবে ইবাদত করেই তিনি অর্জন করেছেন সর্বশ্রেষ্ঠ অবস্থান।

দ্বিতীয় খাদিজা রাযি.। নবীজি সা. এর জন্য তিনি কতো ত্যাগ স্বীকার করেছেন, পড়তে পড়তে চোখ দিয়ে পানি আসে। সত্যি বলবো, আমি জানি, আমি কোনদিন এতোটা করতে পারবো না নিজের স্বামীর জন্য। বরং আমরা তো অতি তুচ্ছ ব্যাপারেও ধৈর্য্যহারা হয়ে পড়ি।

তৃতীয় এবং চতুর্থ স্থানে আছেন ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া ও ফাতিমা রাযি.। দুজনের একজন মা এবং একজন স্ত্রী হিসেবে নিজের দায়িত্ব অত্যন্ত সুষ্ঠুরূপে পালন করেছেন।

এই চারজন নারীর কেউ-ই বাইরে পড়াশোনা করতে যাননি। ঘরের বাইরে গিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য-চাকরি বাকরি করতে যাননি। হ্যাঁ, আপনি বলবেন- ওগুলো তো হাজার বছর আগের কথা ছিল। এখন সময় বদলেছে, এখন নারী-পুরুষ সব সমান। সবাই ঘরের বাইরে যাওয়াই এখন স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদেরকে বুঝতে হবে, দীনের কিছু কন্সট্যান্ট বিষয় আছে। দীনের এই ভিতগুলো যুগের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়ে যায় না। আল্লাহ তাআলা ইসলামকে সব যুগের উপযোগী করেই প্রেরণ করেছেন। এতে হেরফের করার কোন প্রয়োজন নেই।

আমরা সঠিক ইসলামের অনুসারী হলে জেনে থাকবো, আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতের চূড়ান্ত সাফল্য কখনোই এইসব দুনিয়াবী পড়াশোনা কিংবা ক্যারিয়ারের ওপর নির্ভর করে না। রিকশাওয়ালার গরীব বউটা, যে বাচ্চা আর সংসার ছাড়া কিছুই জানে না, সেও জান্নাতে এই লন্ডনে পড়া আমার চাইতে ওপরের অবস্থানে থাকতে পারে, শুধুমাত্র তার ঈমান, আমল, ও ইবাদতের জোরে। আমাদের শুনতে খারাপ লাগতে পারে, কিন্তু সত্য শ্রুতিমধুর না হলেও বদলে যায় না।

বর্তমান সমাজে সম-অধিকারের জোয়ার এসেছে। মেয়েদেরকে পড়াশোনা করতে হবে। শুধু তাই নয়; আমাদেরকে ক্যারিয়ারিস্ট ও অ্যাম্বিশাস হতে হবে। এই ডিগ্রি নেওয়ার কারণই হলো যেন আমরা আমাদের

ক্যারিয়ার নিশ্চিত করতে পারি। যেন দুনিয়াবী একটা পদমর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করতে পারি। সমাজ বেধেই দিয়েছে মেয়েদের কাজগুলো কী কী। মেয়েদেরকে পুরুষের মত ঘর থেকে বের হয়ে অবশ্যই চাকরি-বাকরি করতে হবে। কোন নারী যদি নিজের ইচ্ছায় ঘরে বসে থাকে, যদি সে ভাবে "আমি এতো কষ্ট করে চাকরি করতে চাই না, শুধু সন্তানকে সময় দিতে চাই" তাহলে তাকে বাঁকা চোখে দেখা হবে। লোকের নজরে, সমাজের নজরে সে নিশ্চিতভাবেই নিচু বলে গণ্য হবে। আপনি এটাকে "অধিকার" বলেন? আমি বলবো, চাপিয়ে দেওয়া বোঝা, অত্যাচার, জুলুম। এভাবে নারীদেরকে এমন কিছু কাজ করতে বাধ্য করা হচ্ছে যা তার স্বাভাবিক প্রকৃতির সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কিন্তু সমাজের বেধে দেওয়া স্ট্যান্ডার্ড বলে কথা! এবার পালাবি কোথায়? না চাইলেও এই বোঝা বয়ে বেড়াও। তা নাহলে "সম্মান" থাকবে না।

দুঃখজনক হলেও সত্যি, সম্মান আসলেই থাকে না। সম-অধিকারের কথা বলে ফেনা তোলা বুদ্ধিজীবিরা এমনভাবেই আমাদের জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে মেপে দিয়েছে। এই মাপের চুল পরিমাণ বাইরে গেলেই আমি গোঁড়া, অশিক্ষিত, গোয়ার, মূর্খ, সস্তা হাউজওয়াইফ। আমার চাইতে বাইরে সেজেগুজে কাজ করতে যাওয়া একজন নারীর সম্মান ও মর্যাদা সমাজের চোখে অনেক বেশি। কিন্তু আল্লাহর চোখেও কি তাই? ওয়াল্লাহি, আল্লাহর চোখে যদি তা হতো, তবে কখনোই ঐ চারজন নারী জান্নাতের সর্বোচ্চ আসনের অধিকারী হতেন না।

এবার একটু চিন্তা করে দেখি, কাদের থেকে এই বিকৃত চিন্তার সূচনা?? কারা আমাদেরকে এমন বিকৃত মানসিকতা উপহার (!) দিচ্ছে?

নিঃসন্দেহে ইসলামের বিপরীতে অবস্থিত কিছু মানুষের মগজ থেকে এসবের আগমন। যেই মগজে শয়তান দখল বসিয়ে ভিত্তিহীন কথা বের করে। আমি একবার এখানে এক feminist activist এর সাথে কথা বলেছিলাম। অমুসলিম এক মেয়ে। তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তোমরা অধিকার চাও ঠিক আছে। কার সমান অধিকার চাও? পুরুষের সমান??

হাস্যকর, একজন নারী হয়ে, নারীত্বকে বিলীন করে দিয়ে "পুরুষ জাত" এর সমান হওয়াটাই নাকি আমাদের জীবনের মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত!

তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তোমাদের গন্তব্য কী? ওদের গন্তব্য শেষ পর্যন্ত feminist কাউকে সরকারের উঁচু পদে বসানো। আমি বললাম, তাহলে সেটা কি একজন পুরুষের জন্য unfair হয়ে যায় না? আমরা নিশ্চয়ই জানি, নারী ও পুরুষ এক ধাচে চিন্তাভাবনা বা কাজকর্ম করে না। শারীরিক, মানসিক সবখানেই আমাদের কিছু পার্থক্য স্বাভাবিকভাবেই আছে। তাহলে একজন ফেমিনিস্ট যখন আইন তৈরি করবে, স্বভাবতই তা হবে নারীদের পক্ষে এবং পুরুষের প্রকৃতি ও স্বভাবের বিপক্ষে। কারণ একজন মানুষের পক্ষে বিপরীত লিঙ্গকে ঠিক বিপরীত লিঙ্গের মতো করে বোঝা সম্ভব নয়। ঠিক একই কারণে পুরুষদের তৈরি আইনও নারীদের জন্য যথাযথ হয় না। মেয়েটা একমত হয়েছিল।

কিন্তু তার কাছে কোন সমাধান ছিল না। আল্লাহর পরিচয় নিয়ে গাফেল কারো কাছ থেকে আমি সমাধান পাবার আশাও করি না। কিন্তু সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ আমাদেরকে ইসলাম দিয়েছেন। প্রতিটা সমস্যার সমাধান দিয়েছেন। আমাদের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট আইন তৈরি করে দিয়েছেন। নারীবাদ বা পুরুষতান্ত্রিক একপেশে আইন নয়, মহান রবের পক্ষ থেকে আগত আইন, যিনি আমাদের সৃষ্টিকর্তা এবং আমাদের সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত। এই মহান আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আমাদের দায়িত্ব শিখিয়ে দিয়েছেন। তাই আল্লাহপ্রদত্ত দায়িত্বগুলো কখনোই আমাদের ওপর জুলুম, অন্যায়, unfair নয়। হতে পারে না। আল্লাহ তাআলা নারীকে মাতৃত্ব ও স্ত্রীত্বের দায়িত্ব দিয়ে অসম্মানিত বা জুলুম করেননি; বরং এই সমাজের নিয়মগুলোই জুলুম। আপনি বুঝতে পারছেন না, আপনার কাছে ইসলামের সমাধানটা যুগের অনুপযোগী মনে হচ্ছে, আপনার চিন্তার সীমাবদ্ধতার কারণে। খোলা মনে আলোচনায় বসুন, জ্ঞানী ব্যক্তিদের সাথে কথা বলুন, আপনার সংশয়-সন্দেহ দূর হবে ইনশাআল্লাহ।

আমরা আজকে ইসলামের আদর্শ থেকে হয়ত কয়েক আলোকবর্ষ দূরে পড়ে আছি। আমরা পড়াশুনা কমপ্লিট করার জন্য বিবাহের মতো প্রয়োজনীয় ইবাদত পালন করতে দেরী করি, চাকরি করার জন্য জন্ম-নিয়ন্ত্রণ পিল ব্যবহার করি! সুবহানাল্লাহ! মা হবার মর্যাদাকে আমরা এতো সহজে উপেক্ষা করে ফেলছি। ক্যারিয়ার নিশ্চিত করতে আজ আমরা স্বামীকে সময় দেওয়ার ফুরসত পাই না। হায়! কোথায় মারইয়াম, খাদিজা, ফাতিমা আর কোথায় আমরা!! অথচ আমরাই "নারীদের পড়াশুনার বিপরীতে" কেউ কিছু বললে ধেয়ে যাই। তাকে পারলে সেখানেই ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলি। তাকে বুঝাতে যাই, খাদিজাও তো ব্যবসা করেছিল, হুম! অথচ আমরা ভুলে যাই, খাদিজা ব্যবসা করার জন্যে বাড়ির বাইরে পা রাখেননি। আমরা মনে রাখতে চাই না, খাদিজা, মারইমায়, আসিয়া, ফাতিমাদের জীবনের অন্যান্য দিকগুলো!

আমরা এভাবে ভাবি না যে, উনারা তো সেক্যুলার পড়াশুনাও করেননি, তবে আমরা কেন ফিতনা মাথায়

নিয়েও সেক্যুলার পড়াশোনা ও চাকরি-বাকরি করবো?

এবার একটু চিন্তা করে দেখুন! কেন আমরা "সেক্যুলার শিক্ষা"র বিপরীতে যুক্তি শুনলে এতো ক্ষেপা? কেন স্ত্রী হবার কথা, বাচ্চা নেবার কথা আসলেই আমাদের মুখ চুপসে যায়? কেন আল্লাহর দেওয়া নারীদের ঘরের ভেতরে থাকার নির্দেশটা আমাদের চোখে পড়ে না?

এর কারণ আমরা আসলে ইসলামকে দেখি কাফেরদের লেন্স থেকে। তারা যেভাবে দেখাতে চায়, সেভাবে। কাফের ভার্সনের একটা মডারেট ইসলাম তৈরি হয়েছে। সেখানে ইসলামের লেবাস জড়িয়ে জাহেলিয়াত পালন করা যায়। আমরা জেনে না জেনে সেটাই করি। কাফেররা আমাদেরকে ফেমিনিজম শেখাতে চেয়েছে, তারা সফল। আমাদেরকে ক্যারিয়ারিস্ট করতে চেয়েছে, সেখানেও আমরা ধোঁকা খেয়ে বসে আছি।

আজকে সমাজে সম-অধিকারের জয়জয়কার। নারীবাদের দাপটে টেকা দায়! তাই আমি অবশ্যই মনে করি, নারীদের ব্যাপারে ইসলামের সঠিক শিক্ষা, সাহাবীদের ঐতিহ্য ও জান্নাতী রমণীদের জীবন থেকে মানুষকে বোঝানো দরকার খুবই বেশি। এই দায়িত্ব শুধু আলেমদের নয়, এই দায়িত্ব আপনার-আমার-সবার। এই পুরো লেখাটি লেখার কারণ একজন মাওলানার ভিডিও। যিনি উত্তম ভাষাশৈলী ব্যবহার না করলেও মূলত উপরের বক্তব্যই দিতে চেয়েছেন। এই আলেমকে আমি চিনি না, কোনদিন নামটাও শুনিনি, আর আমি তার অনুসারীও নই। কিন্তু আল্লাহর শপথ! আমি এই আলেমের চাইতে তাদেরকে অনেক বেশি ভয়াবহ ও ইসলামের শত্রু মনে করি, যারা ইসলামের সত্যিকার শিক্ষাকেই বদলে দিচ্ছে। যারা ক্রমাগত কাফেরদের চিন্তাচেতনায় প্রভাবিত হচ্ছে। যারা সমাজের বুদ্ধিজীবিদের এজেন্ডা পালনের জন্যই ইসলামকে ব্যবহার করে চলেছে, জেনে কিংবা না-জেনে।

কই আমরা তো তাদের দিকে তেড়ে যাচ্ছি না? আসলে তারা এতোটাই সূক্ষ্মভাবে আমাদের মন ও মগজকে কব্জা করে ফেলেছে যে, আমরা তাদের চালগুলো ধরতেই পারিনা। কিন্তু প্রভাবিত আমরা নিঃসন্দেহে হয়েছি। আর তাই তো, সেক্যুলার লেখাপড়া বাদ দেবার কথা শুনলে আমাদের মাথা গরম হয়ে যায়। কিন্তু ঘরে বসে স্ত্রীর দায়িত্ব পালন করার কথায় আমরা ইতস্তত করি। তখন আর একমত হতে পারি না যে ইসলাম নারীদের বাইরে যাওয়া অপছন্দ করে। তখন আমাদের চুলকানি শুরু হয়। বাচ্চা পেছানোর কথা উঠলে আমরা তো নির্বিকার। এগুলো যেন কোন সমস্যাই না! নিকাব পরে অনেকের মুখেই শুনি- তুমি কেন নিকাব পরো, এটা কি ফরয? অথচ সেক্যুলার পড়াশোনা একটা মুবাহ বা ঐচ্ছিক কাজ। সেটা নিয়ে কিন্তু আমাদের মনে এতো প্রশ্ন নেই। আমরা আসলে কোন বিষয়টাকে সবচেয়ে গুরুত্ব দিচ্ছি? আল্লাহর ইবাদত, নাকি সমাজের রীতিনীতি? শেষ পর্যন্ত, আমরা আসলে ঐ ইসলামের নামে দুই নৌকায় পা দিয়েই চলছি। জাহেলিয়াতের বীজ এখনো আমাদের মাথায় গেঁড়ে আছে বলেই ইসলামের শিক্ষা মেনে নিতে আমাদের গা কুটকুট করে।

আল্লাহ আমাদেরকে হিদায়াত দিক! আমাদেরকে জাহেলিয়াত থেকে মুক্তি দিক, আমীন।

আমি নিজে সেক্যুলার এডুকেশন নিয়ে পড়ে আছি। আমি হয়ত স্বামীর মন জয় করতে পারছি না, কিন্তু তারপরেও আজ এই বড় বড় কথাগুলো বললাম। নিজের দুর্বলতার কারণে যেন সত্য প্রকাশে আমরা কুণ্ঠিত না হই। সবার কাছে দু'আ চাই যেন সমাজের বেড়াজাল থেকে নিজের চিন্তাচেতনাকে মুক্ত করতে পারি, যেন ইসলামের আলোয় নিজেকে আলোকিত করতে পারি। আমি একজন বিবাহিত নারী। সুতরাং স্ত্রী এবং মা হিসেবে আমার সাফল্যেই আমার দুনিয়া ও আখিরাতের সাফল্য নিহিত। এই কথাটা আমরা সব মুসলিমাহ যত তাড়াতাড়ি বুঝবো, ততোই মঙ্গল।

সবাই আমার জন্য দু'আ করবেন যেন নেক স্ত্রী ও নেক সন্তানদের মা হতে পারি। জাযাকুমুল্লাহু খাইর।

কখনও ঝরে যেও না ...

-তারেক মেহান্না



মু'মিন ব্যক্তির উদাহরণ হচ্ছে বৃক্ষের মতো যাকে সবসময় প্রবাহমান বাতাসের সাথে যুদ্ধ করে টিকে থাকতে হয়। আর এই ক্রমধাবমান বাতাসের ঝাপটার মাঝে বেঁচে থাকতে হলে সে বৃক্ষটির কিছু গুণ থাকা চাই। যেমন, সুন্দরভাবে বেড়ে ওঠতে হলে গাছটির বীজ অবশ্যই উর্বর মাটিতে বপন করতে হবে। কুরআনে ঠিক এ কথাটাই বলা হয়েছে,

﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾

অর্থ: "মুহাম্মদ সা. আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর সহচরগণ কাফেরদের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর...। তাওরাতে এবং ইঞ্জিলে তাদের বর্ণনা এরূপ যেমন একটি চারা গাছ যা থেকে নির্গত হয় কিশলয়, অতঃপর তা শক্ত ও মজবুত হয় এবং কাণ্ডের উপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে, চাষীকে আনন্দে অভিভূত করে, যেন আল্লাহ তাদের দ্বারা কাফেরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন..." [সূরা ফাতহ, আয়াত ২৯]

তাওরাতের যে বিবরণটির কথা এখানে বলা হয়েছে তা হল এই,

"কৃষক তার বীজ বুনতে বের হলো, এবং বীজ বপনের সময় কিছু পথের পাশে পড়ল, সেগুলো পায়ের নিচে পিষ্ট হল এবং পাখিরা সেগুলো খেয়ে ফেললো। কিছু বীজ পড়ল পাথুরে মাটিতে, আর সেগুলো আর্দ্রতার অভাবে বড় হতে হতেই শুকিয়ে গেলো। কিছু বীজ কাঁটার মাঝে পড়ল আর কাঁটাগুলোও সেগুলোর সাথে বেড়ে ওঠে একসময় গাছগুলোকে মেরে ফেলল। বাকি বীজগুলো পড়ল উর্বর মাটিতে আর বেড়ে ওঠল, আর বেড়ে ওঠে শতগুণ বেশী শস্য উৎপাদন করল।

... এর তুলনা হল এই, বীজগুলো হল সৃষ্টিকর্তার বাণী। পথের পাশের গাছগুলো হল তাদের তুলনা যারা শুনল আর তারপর শয়তান এসে সেই বাণীগুলো তাদের অন্তর থেকে মুছে দিল যার ফলে তারা বিশ্বাস করবেনা এবং রক্ষা পাবেনা।

পাথুরে মাটির গাছগুলো হল তারা, যারা শুনার সময় আগ্রহের সাথে শুনে কিন্তু এদের দৃঢ় কোন মূল নেই এরা কিছু সময়ের জন্য বিশ্বাস করে কিন্তু প্রলোভন দেখালেই বিচ্যুত হয়ে পড়ে যে বীজগুলো কাঁটার মাঝে পড়েছিল, এরা হল তারা যারা সৃষ্টিকর্তার বাণী শুনেছে কিন্তু পথ চলার সাথে সাথে ভয় আর দুনিয়ার মোহে আটকে গিয়ে পূর্ণতা লাভ করতে ব্যর্থ হয়।

কিন্তু যেই বীজগুলো উর্বর মাটিতে পড়েছিল, এরাই হল তারা যারা সৎ এবং শুদ্ধ হৃদয় নিয়ে সৃষ্টিকর্তার বাণী শুনেছিল, তা আঁকড়ে ধরেছিল এবং ধৈর্য্যের সাথে পরিশেষে ফল লাভ করেছিল।" (....)

অর্থাৎ, হৃদয়কে এমন উর্বর মাটির সাথে তুলনা করা হয়েছে যেখানে বীজ বপন করা হয়। ইমাম ইবনুল ক্বাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) আল-ফাওয়াইদ গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ৭০) এভাবেই বলেছেন, "সবার হৃদয়ের স্বাভাবিক অবস্থাই হচ্ছে উর্বর, এতে যা বপন করা হয় তাই সহজে বেড়ে ওঠে। যদি ঈমান এবং আল্লাহ ভীরুতা বা তাক্বওয়ার গাছ এতে রোপণ করা হয়, তবে তা এমন সুমিষ্ট ফল দান করবে যা হবে চিরন্তন। আর যদি অজ্ঞতা এবং কামনা-বাসনার চারা রোপণ করা হয় তাহলে তার ফলও হবে তিক্ত এবং কটু।"

তাই তুমি যখন তোমার অন্তরকে ঈমানের বীজের জন্য উর্বর করে তুলবে, তখন সেই গাছটি সুন্দরভাবে বেড়ে ওঠবে এবং মিষ্টি ফল ধারণ করবে। হৃদয়কে উর্বর করার পন্থাসমূহ সামনে আলোচনা করা হবে।

যখন তোমার হৃদয়ে ঈমানের সুদৃঢ় বৃক্ষ গড়ে ওঠবে, একটা দমকা হাওয়া তোমার দিকে ধেয়ে আসবে। কারণ ওপরে বর্ণিত আয়াত অনুযায়ী আল্লাহ তাআলা বলছেন, শক্ত গাছটি 'কাফেরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করে' একজন দৃঢ় মুসলিম এর মত আর কোন কিছুই এই বাতাসকে এতটা ক্ষেপিয়ে তোলেনা। আর এটাই আদিকাল থেকে চলে আসা বাস্তবতা। যখন ফেরআউন মুসা আলাইহিস সালাম এবং তাঁর অনুসারীদের পিছনে মিশরের মরুভুমিতে ধাওয়া করছিল তখন সে সুনির্দিষ্টভাবে অভিযোগ করেঃ

﴿ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ (54) وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ (55) ﴾

অর্থ: "নিশ্চয়ই এরা (বনী-ইসরাঈলরা) ক্ষুদ্র একটি দল এবং তারা আমাদের ক্রোধের উদ্রেক করেছে।" [সূরা শুআরা, আয়াত ৫৪-৫৫]

এই দমকা হাওয়া তোমাকে সমূলে উচ্ছেদ করে ফেলে দিতে চাইবে। তুমি হয়ত চারিদিকে তাকিয়ে অন্য কিছু গাছ দেখবে, সহজেই পড়ে যেতে, বাতাসের ধাক্কায় সমূলে উৎপাটিত হতে। এরা হল মুনাফিক্বেরা, যাদের দুর্বল মূল অবশেষে প্রকাশ হয়ে পড়েছে,

﴿ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ﴾

অর্থ: "এবং নোংরা বাক্যের উদাহরণ হলো নোংরা বৃক্ষ। একে মাটির ওপর থেকে উপড়ে নেয়া হয়েছে। এর কোন স্থিতি নেই।" [সূরা ইব্রাহিম, আয়াত ২৬]

এবং রাসূল মুহাম্মাদ সা. বিশেষভাবে মুনাফিক্বকে এমন গাছের সাথে তুলনা করেছেন যেটা বাতাসের সাথে সাথে নড়ে এবং কখনো বা পড়ে যায়। (দেখুন আল লু'লু' ওয়াল মারজান, হাদিস ১৭৯১)

সুতরাং তুমি তাদের মতো হবে না, তাদের যতজনই বাতাসের ধাক্কায় পড়ে যাক না কেন। বরং, তুমি তাদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন কর, আল্লাহকে ধন্যবাদ দাও যে তিনি তোমাকে তাদের পরিণতি থেকে রক্ষা করেছেন এবং তারপর এগিয়ে যাও। তাদের জন্য ইসলাম ছিল একটা শখ মাত্র, এ সপ্তাহের আকর্ষণ!

যখন বাতাস বুঝতে পারবে যে তোমাকে এভাবে মাটি থেকে সরাসরি তুলে ফেলা সম্ভব নয়, তখন সে আরো সূক্ষ্ম পন্থা অবলম্বন করবে, সে চেষ্টা করবে তোমার পাতাগুলো যেন ঝরে পড়ে। কিন্তু সে তোমাকে সবগুলোপাতা একসাথে ঝরাতে বলবে না। কারণ সেটা তার দুরভিসন্ধি প্রকাশ করে দেবে। বরং তখন সেই বাতাস মৃদুভাবে বইবে যাতে করে তোমার একটা পাতা ঝরাতে পারে, তারপর আরেকটা, তারপর আরেকটা, যতক্ষণ না তুমি পাতাহীন বৃক্ষে পরিণত হও। উস্তাদ সাইয়্যিদ কুতুব এটা সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন,

"... যারা কোন আদর্শের পক্ষে দাঁড়ায় তাদের প্রতি শাসকবর্গের আচরণ হয় এমন যে, তারা সবসময় কূটকৌশলের মাধ্যমে তাদেরকে তাদের দৃঢ় অবস্থান থেকে শুধু সামান্য বিচ্যুত করতে চায়। তারা এর মাধ্যমে একটা সমঝোতামূলক সমাধানে আসতে চায় যাতে করে কিছু পুরস্কারের বিনিময়ে তারা তাদেরকে বোকা বানাতে পারে। এমন অনেকেই রয়েছে যারা ভাবে যে, তারা তাদের আদর্শের জন্য লড়ছে কিন্তু বস্তুত তাদেরকে তাদের আদর্শ থেকেই বিচ্যুত করে দেয়া হয়েছে কারণ তারা এই সমঝোতাগুলোকে বড় করে দেখেনা। তাই বিরোধীপক্ষও তাদেরকে আদর্শ ত্যাগ করতে বলেনা, বরং এদিকে সেদিকে হালকা পরিবর্তন করতে অনুরোধ করে যাতে উভয়পক্ষ মাঝখানে মিলিত হতে পারে।

যে মানুষটি আদর্শের পক্ষে লড়ছে শয়তান তাঁকে এই বলে ধোঁকা দেয় যে, কর্তৃপক্ষের সাথে সামান্য সমঝোতার মাধ্যমে তুমি তোমার আদর্শকে আরো সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। কিন্তু পথের শুরুতে যে বিচ্যুতি ছিল খুব সামান্য, পথের শেষে তা-ই বিশাল হয়ে দেখা দেয়। আদর্শের সেই পতাকাবাহী, যে ক্ষুদ্র কোন বিষয়ে আপোষ করতে রাজি হয় সে আসলে সেখানেই থেমে যেতে পারেনা, কারণ এরপর যখনই সে এক পা পিছিয়ে যাবে তখনি সেটা ঠেকাতে তার সমঝোতায় আসার ইচ্ছা আরো বৃদ্ধি পাবে। তাই কর্তৃপক্ষ এই আদর্শবাদীদেরকে অতি সন্তর্পণে এবং ক্রমান্বয়ে তাদের আদর্শ থেকে টলাতে থাকে..."

তাই এই ফাঁদে পা দেয়া যাবে না, বাতাসের মুখে একটা পাতাকেও ঝরতে দেবে না। যেভাবে রাসূলুল্লাহ সা. মুনাফিক্বকে বাতাসের সাথে নুয়ে পড়া গাছের তুলনা দিয়েছেন তেমনিভাবে মু'মিনকে খেজুর গাছের সাথে তুলনা করেছেন- কারণ খেজুর গাছের পাতা কখনো ঝরেনা। (দেখুন আল-লু'লু' ওয়াল মারজান, হাদিস ১৭৯২) বাতাস যতই তীব্র হোক না কেন তার সামনে মুসলিম শুধু দাড়িয়েই থাকে না, বরং একটা পাতাও ঝরতে দেয়না। বাতাস যত তীব্র হবে তোমার পাতাকে আরো শক্ত করে আঁকড়ে ধরবে। আর এ জন্যই তো তোমার বিরুদ্ধে বাতাসের এত ক্ষোভ!

﴿ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴾

অর্থ: "আর তারা এদের প্রতি বিরূপ ছিল না এই ব্যতীত যে এরা মহাশক্তিশালী পরম প্রশংসিত আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল।" [সূরা বুরুজ, আয়াত ৮]

কিন্তু এই বাতাস তার ক্ষোভের পেছনে ভিন্ন কারণ দাঁড় করিয়ে এই বাস্তবতাকে লুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করবে। সে দাবী করবে এই রাগ উগ্রবাদ, জঙ্গিবাদ কিংবা অন্য কোন কিছুর বিরুদ্ধে। কিন্তু সত্য কথাটা হচ্ছে সে সেসব মুসলিমদেরকে খুব অপছন্দ করে যাদেরকে সে সমূলে তুলে ফেলতে পারেনা, যাদেরকে তাদের আদর্শ থেকে এক বিন্দুও টলানো যায় না। আর যখন গাছটা একটা পাতাও ত্যাগ করতে অস্বীকার করে তখন সেই বাতাস আরো রেগে যায়। আর যখন এই বাতাস রাগতে থাকবে, তখন আল্লাহ্ তোমাকে পুরস্কৃত করবেন,

وَلا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ

অর্থ: "...এবং তাদের এমন পদক্ষেপ যা কাফেরদের মনে ক্রোধের কারণ হয় আর শত্রুদের পক্ষ থেকে তারা যা কিছু প্রাপ্ত হয় তার প্রত্যেকটির পরিবর্তে তাদের জন্য লিখিত হয়ে নেক আমল। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সৎকর্মশীল লোকদের হক নষ্ট করেন না।" [সূরা তওবাহ, আয়াত ১২০]

তাই যখন প্রবল আক্রোশে বাতাস বইবে তখন ভয় পেওনা। বরং তার চোখে চোখ রাখো আর

قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ

অর্থ: "...বল, তোমরা আক্রোশে মরতে থাক।" [সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১১৯]

ঐ পাতাগুলো হচ্ছে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে তোমার প্রতি আমানত যা আল্লাহ্ তোমাকে রক্ষণাবেক্ষণ করতে দিয়েছেন। যদি তুমি তার খিয়ানত কর তবে তোমাকে তাদের দ্বারা পরিবর্তন করে দেয়া হবে যারা তা করবেনা,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

অর্থ: "হে মুমিনগণ! তোমাদের মধ্যে যে স্বীয় দীন থেকে ফিরে যাবে, অচিরেই আল্লাহ এমন সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন এবং তারা তাঁকে ভালোবাসবে। তারা মুসলমানদের প্রতি বিনয়-নম্র হবে এবং কাফেরদের প্রতি কঠোর হবে। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভীত হবে না। এটি আল্লাহর অনুগ্রহ- তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন।... [সূরা মায়িদা, আয়াত ৫৪]

এই আয়াতটি খুব সংক্ষিপ্তভাবে গাছ এবং পাতাগুলোর বর্ণনা দেয়। এটাকে বীজ এবং পাতায় বিশেষণ করা যাক।

সম্পূর্ণ গাছটি হচ্ছে দ্বীন।

তোমার এবং আল্লাহর মধ্যে ভালোবাসার সম্পর্ক হচ্ছে সেই বীজ যা থেকে গাছটি অঙ্কুরিত হবে। ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ) এর একটি সুন্দর প্রবন্ধ রয়েছে আত-তুহফাহ আল ইরাক্বিয়াহ নামে, যা মাজমু আল ফাতওয়া এর দশম খন্ডের শুরুতে পাওয়া যায়, যেখানে তিনি এই আয়াতে উল্লেখিত ভালোবাসার কথা ব্যাখ্যা করছেন এইভাবে,

"আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের জন্য ভালোবাসা হচ্ছে ঈমানের সর্বোচ্চ বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে একটি এবং ঈমানের সর্বোচ্চ মূলনীতি। কার্যত এটিই দ্বীনের সকল আমলের মূল ভিত্তি... মুসা এবং ঈসা (আলাইহিমুস সালাম) এর বর্ণিত ভাষ্য অনুযায়ী, আমাদের পূর্ববর্তী দুটি জাতি, ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের প্রতি রেখে যাওয়া সর্বোত্তম উপদেশ হচ্ছে হৃদয়, মন এবং সদিচ্ছা দ্বারা সর্বান্তকরণে আল্লাহকে ভালোবাসা। এটাই ইব্রাহীমের (আলাইহিস সালাম) দ্বীনের আক্বীদার সারকথা যা তাওরাত, ইঞ্জীল এবং কুরআনের আইনের নির্যাস।"

আল্লাহ্‌র জন্য ভালোবাসাই হচ্ছে সেই বীজ যা থেকে প্রতিটি কাজ এবং বিশ্বাস প্রতিটি পাতা এবং ফল- অঙ্কুরিত হয় আর এজন্যই এই ভালোবাসাটাই এ আয়াতে সর্বপ্রথম উল্লেখ করা হয়েছে।

তারপর আমরা লাভ করব সেই বীজের প্রথম ফল, ওয়ালা' এবং বারা' : "মুসলমানদের প্রতি বিনয়-নম্র হবে এবং কাফেরদের প্রতি কঠোর হবে। ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ এ বিষয়ে বর্ণনা করেন,

"মানুষ যাকে ভালোবাসে তার ভালোবাসার মানুষকেও ভালোবাসে, সে যা ঘৃণা করে তাও ঘৃণা করে, তার সহযোগীদের প্রতি বিশ্বস্ত থাকে, তার শত্রুদের প্রতি শত্রুভাব পোষণ করে... তাই এই বিষয়ে তারা উভয়েই এক"

সহজ ভাষায় বললে, বাতাসের প্রথম কাজ হচ্ছে তোমার এই পাতাটি ঝরিয়ে দেওয়া যাতে করে তোমার মনে শত্রু আর বন্ধুর মাঝে বিভাজন রেখাটা অস্পষ্ট হয়ে পড়ে। একবার যখন তুমি তোমার শত্রুকে বন্ধু ভাববে, তোমার শত্রুর কাজ তখনি সম্পন্ন হয়ে যাবে। তাই কখনো এই পাতাটি ঝরে যেতে দেবেনা। কখনো না!

এর পরের পাতাটি হচ্ছে জিহাদঃ “...তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে...” স্পষ্টতই এটি সেই পাতা যা বাতাস অন্যগুলোর চেয়ে বেশী ঘৃণা করে। কেন তা বোঝার জন্য এইডস এর কথা ভাবো। এটা শরীরকে মেরে ফেলার জন্য কি করে? এটা কিন্তু সরাসরি শরীরকে আক্রমণ করেনা বরং এটি শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে অর্থাৎ শরীরের ‘প্রতিরক্ষা বাহিনী’কে আক্রমণ করে যাতে করে অন্যান্য রোগ জীবাণু কোন রকম বাধা ছাড়াই আক্রমণ করতে পারে। এই শরীরটা হচ্ছে মুসলিম উম্মাহর মতো, জিহাদ হচ্ছে এর রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে সে আক্রমণকারীদের থেকে নিজেকে রক্ষা করে। আর সেই বাতাস/সরকার হচ্ছে এইডসের মত যা প্রতিরোধের এই স্পৃহাটাকে মেরে ফেলার জন্য কাজ করে যাতে করে মুসলিম উম্মাহকে আক্রমণ এবং দখল করে নেওয়া সহজ হয়ে যায়। এই কারণেই সাইয়্যিদ কুতুব, আব্দুল্লাহ আযযাম, আয-যারক্বাওয়ী, শাইখ ওসামা (রহিমাহুমুল্লাহ) প্রমুখদের মতো লোকদেরকে দানব রূপে চিত্রিত করা হয়- কারণ এরা প্রতিরোধের সেই চেতনাকে ধারণ করেন। আর তাই বাতাস সবচেয়ে জোরালোভাবে বইতে থাকবে তখনি, যখন সে তোমার এই পাতাটি ঝরিয়ে দিতে চায়। এই ফাঁদে পা দিওনা। মনে রেখো এটা এইডস!

পরিশেষে সুদৃঢ় বৃক্ষ সেটাই যা “কোন নিন্দাকারীর নিন্দায় ভীত হবে না।” অর্থাৎ, সেই বৃক্ষটি বস্তুত তিরস্কারে আক্রান্ত হবে, তবে সেভাবে নয়, যেমনটি আশা করা হয়েছিল! সেটা কেমন হবে? যখন বাতাস তোমার পাতাগুলো ঝরিয়ে দিতে চায়- যখন সে তোমাকে আক্রমণ আর তিরস্কার করে ‘ওয়ালা এবং বারা’ আর জিহাদের ধারণাকে আঁকড়ে ধরে রাখার কারণে-

ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, “যার হৃদয় আল্লাহ্‌র জন্য ভালোবাসায় পরিপূর্ণ সে অন্য কারো সমালোচনা বা তিরস্কারে দমে যায়না বরং এগুলো তাকে আরো শক্তভাবে দ্বীনকে আঁকড়ে ধরতে প্রেরণা যোগায়...”

সবশেষে এই আয়াত আমাদেরকে সেই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি দেয় যে কুর’আনের এই শিক্ষাগুলোর প্রতি সৎ থাকতে পারা হলো, “আল্লাহর অনুগ্রহ-তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন”, বাতাসের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারাটা সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্‌র একটা অনুগ্রহ। একটা গাছকে সোজা হয়ে দাঁড় করিয়ে রাখতে বা ধুলায় মিশিয়ে দেয়ার ব্যাপারে আল্লাহই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী...

﴿ أَفَرَأَيْتُم مَا تَحْرُثُونَ. أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ.لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴾

অর্থ: “তোমরা যে বীজ বপন কর, সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? তোমরা তাকে উৎপন্ন করেছো নাকি উৎপন্নকারী আমি? ইচ্ছা করলে তাকে খড়কুটা করে দিতে পারি, অতঃপর হয়ে যাবে তোমরা বিস্ময়াবিষ্ট।” (সূরা ওয়াক্বিয়াহ, আয়াত ৬৩-৬৫)

এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ রাসূলুল্লাহ সা. আমাদেরকে সতর্ক করেছেন যে, শেষ জামানায় কারো বদলে যাওয়াটা খুব সহজ হয়ে পড়বে। মানুষ চাপে পড়ে এবং নিজেদের দূর্বলতার কারণে খুব দ্রুত সত্যকে ত্যাগ করবে। তিনি সা. বলেন,

“তোমরা অন্ধকার রাতের টুকরোগুলোর মত (যা একটার পর একটা আসতে থাকে এমন) ফিতনা আসার পূর্বে নেকীর কাজ দ্রুত করে ফেলো। সেই সময়ে মানুষ সকালে মু’মিন হয়ে ঘুম থেকে ওঠবে এবং রাত শুরু করবে কাফের হয়ে, অথবা সে রাত শুরু করবে মু’মিন হয়ে এবং সকালে ঘুম থেকে ওঠবে কাফের হয়ে...।”

এই ধরণের ঘটনাগুলো হচ্ছে কিছু অজানা বা গায়েবী কারণের ফল যা আমরা মানুষেরা ঠিক উপলব্ধি করতে পারব না। তবে, কুরআন এবং সুন্নাহতে এমন কিছু ব্যবহারিক উপায় বলে দেয়া আছে যার সাহায্যে আমরা মানবজীবনের ইতিহাসের সত্যের পথে থাকতে পারি। এখানে আমরা শুধু দুটি উপায় আলোচনা করব এবং দুটিই একটি দৃঢ় বৃক্ষের সর্বপ্রথম শর্তটির উপর আলোকপাত করে

উর্বর জমিতে বপন- একটি সুস্থ হৃদয়।

* রাসুলুল্লাহ সা. মক্কায় যখন কঠিনতম পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তাঁর প্রতি নাযিলকৃত সূরা সমূহের মূল বিষয় ছিল পূর্ববর্তী নবীদের কাহিনী। ইসলামের জন্য কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন যে তিনিই প্রথম নন, বরং যুগে যুগে এমন আরো অনেকেই ছিলেন, এটা বোঝানোই ছিল এর উদ্দেশ্য। একই সাথে আগের নবীরা কিভাবে এসব পরীক্ষার মোকাবিলা করেছিলেন তাঁকে সে শিক্ষাও দেয়া হচ্ছিল। মক্কার বিপদের ঘনঘটায় আচ্ছন্ন দিনগুলোতে এই ইতিহাসের গল্পগুলো রাসূলুল্লাহ সা. এবং সাহাবীদের মনোবল দৃঢ় করতে বিশাল ভূমিকা রেখেছিল। এই কথাটিই নিম্নোক্ত আয়াতে প্রতিফলিত হয়,

﴿ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾

অর্থ: “আর আমি রাসূলগণের সব বৃত্তান্তই তোমাকে বলছি, যদদ্বারা তোমার অন্তরকে মজবুত করছি। আর এভাবে তোমার নিকট মহাসত্য এবং ঈমানদারদের জন্য নসীহত ও স্মরণীয় বিষয়বস্তু এসেছে।” (সূরা হুদ, আয়াত ১২০)

একইভাবে প্রথম দিককার মুসলিমদের সেইসব কঠোর পরীক্ষার দিনগুলোর পাশাপাশি ইতিহাস, বিশেষভাবে সেই সকল মুসলিমদের ইতিহাস অধ্যয়ন করাটা উপকারী হতে পারে যারা ইতিহাসে কোন না কোন প্রকারের সাহসী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। অনেক সময় কোন একটা পরিস্থিতিতে

আমাদের করণীয় বুঝে ওঠতে আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে ফিক্বহের বই ঘাঁটি যেখানে শুধুমাত্র সৎকর্মশীলদের জীবনী পড়েই, আমরা তাদের ব্যক্তিত্বকে আত্মস্থ করার মধ্য দিয়ে আমাদের করণীয় সম্বন্ধে আরো ভালো দিক নির্দেশনা পেতে পারি। "সাফাহাত মিন সবরিল উলামা" (আলেমদের সবরের পাতা থেকে) নামক অসাধারণ বইটিতে লেখক বলেন,

"নিজের মধ্যে সৎগুণের বিকাশ ঘটাতে এবং মহৎ উদ্দেশ্যে কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকারের মানসিকতা তৈরী করার একটি ভালো উপায় হচ্ছে সেই সকল আলেমদের জীবনী পড়া যারা তাঁদের অর্জিত ইলমের ওপর আ'মল করেছেন। এটা তাদেরকে অনুসরণ করতে সহায়তা করে যারা সেইসব উদ্দেশ্যের জন্য অধ্যবসায়ের সাথে ত্যাগ স্বীকার করে গিয়েছেন। বলা হয়ে থাকে এই কাহিনীগুলো হচ্ছে আলাহ্‌র সেই সকল সৈন্য যার মাধ্যমে আল্লাহ্‌ তাঁর মিত্রদের অন্তরকে সুস্থির রাখেন। ইমাম আবু হানিফা (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, "আলেমদের জীবনী এবং তাঁদের গুণাবলী অধ্যয়ন আমার কাছে ইলমের চেয়ে বেশী প্রিয়, কারণ এগুলো তাঁদের চরিত্র বর্ণনা করে।"

তাই সৎকর্মশীলদের জীবনী অধ্যয়ন, তাঁদের ব্যক্তিত্ব এবং চরিত্রকে আপন করে নেয়া অন্তরকে শক্তিশালী এবং জীবন্ত করার একটি ভালো উপায় যা ঈমান এবং ইলমের বীজ বপনের জন্য অন্তরকে উর্বর করে তোলে। তাহলে কোথা থেকে শুরু করা উচিত? শায়েখ ইবনুল জাওযী (রাহিমাহুল্লাহ), সাঈদ আল খাতির গ্রন্থের ৬০ পৃষ্ঠায় বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. এবং তার সাহাবীদের জীবনী থেকেই সবচেয়ে বেশি উপকারী জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব।

* অন্তরকে দৃঢ় করার দ্বিতীয় উপায়টি আরো সহজঃ শুধু তোমার রব এর কাছে চাও! উম্মে সালামাহ (রাদি'আল্লাহু আনহা) কে একবার জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, রাসূলুল্লাহ সা. কোন দুআটি সবচেয়ে বেশী করতেন তখন তিনি উত্তরে বলেন,

"ওনার সবচেয়ে বেশী করা দুআটি ছিল, ও অন্তর সমূহের নিয়ন্ত্রণকারী! আমার অন্তরকে তোমার দ্বীনের ওপর স্থির করে দাও। (ইয়া মুক্বাল্লিবাল ক্বুলুব, সাব্বিত ক্বলবি 'আলা দ্বীনিক)"

এই উপায়টি সবসময় সারাদিন অভ্যাস করা উচিৎ। কাজে যাওয়ার সময় কিংবা স্কুলের বারান্দা দিয়ে হাঁটার সময়, যখনি সুযোগ পাওয়া যায় তখনি এই সহজ দুআটি পুনরাবৃত্তি করার অভ্যাস করা উচিৎ। গুপ্তধনের মতো এই দুআটিকে আঁকড়ে রাখা উচিৎ এবং সর্বদা এটিকে ঠোঁটের আগায় রেখে অন্তরকে ইসলামের সাথে সংযুক্ত করে রাখা উচিৎ। এটা খুবই সহজ হওয়া সত্ত্বেও এটা যাদের খুব প্রয়োজন এমন অনেকেই এটিকে অবহেলা করে।

তাই হৃদয়কে স্থির এবং সুস্থ রাখার মাধ্যমে, সেই জমিকে উর্বর রাখার মাধ্যমে তোমার শিকড়কে সুদৃঢ় করে রাখো। আর দৃঢ় শিকড় বিশিষ্ট গাছগুলোর শাখা প্রশাখাই একদিন আকাশ ছোঁবে।

﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ﴾

অর্থ: "তুমি কি দেখ না, আল্লাহ তাআলা কীভাবে উপমা পেশ করেছেন? পবিত্র বাক্য হলো একটি ভাল বৃক্ষের ন্যায়, যার শিকড় মজবুত আর শাখা-প্রশাখা আকাশে উত্থিত।" [সূরা ইব্রাহীম, আয়াত ২৪]

আর যখন তোমার শাখা-প্রশাখা আকাশ ছোঁবে, তখন কেউ তোমার পাতা পর্যন্ত পৌঁছুতে পারবেনা। তারা তোমাকে বন্দী করতে পারে, তোমাকে হত্যা করতে পারে কিন্তু তারা কখনো এ কথা বলতে পারবে না যে তারা তোমার পাতা ঝরাতে পেরেছিল...

বুধবার, ৪ সফর ১৪৩৩/ ২৮ ডিসেম্বর,২০১১

হিন্দুরা বীর হয় কীভাবে?

আবু আব্দুল্লাহ

হিন্দুরা বীর হয় কীভাবে? কথা উঠেছে হিন্দুদের বীরত্ব নিয়ে। কিন্তু আমার বুঝে আসে না, হিন্দুরা বীর হয় কীভাবে?

● এরা তো সেই হিন্দু, যাদের রাজা লক্ষনসেন বখতিয়ারের মাত্র ১৮ অশ্বারোহীর ভয়ে পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়েছে!

● এরা তো সেই কাপুরুষ জাতি, যাদেরকে মাত্র সতের বছরের বিন কাসিম সেই আরব থেকে এসে সিন্ধু পর্যন্ত তাড়িয়ে এনেছিলেন!

● এরা তো সেই হনুমান পুজারি, যাদেরকে সুলতান মাহমুদ গজনবি সতের বার পরাজিত করে সোমনাথের মূর্তি সংহার করেছেন!

● এরা তো সেই মারাঠা হিন্দু, যাদের তিন লক্ষ সেনাকে আহমদ শাহ আবদালির মাত্র সাত হাজার মুজাহিদ পানিপথের ময়দানে পরাভূত করেছেন!

ইতিহাস পড়ে দেখুন, মুসলমানরা অন্যকোনো জাতিকে এতো তাড়াতাড়ি পরাজিত করেননি, যেভাবে হিন্দুদের পরাজিত করেছেন। এই ভারতের হিন্দুদের অধিকাংশ ইতিহাস কেটেছে পরাজিত হিসেবে। হিন্দুরা যদি শৃগালের চাতুরতার পথ না ধরত, তাহলে তারা আজো আমাদের দাস হয়ে থাকতো।

আচ্ছা, আজ পর্যন্ত কখনো শুনেছেন, হিন্দুরা ভারতবর্ষ ছেড়ে অন্যকোনো ভু-খন্ডের এক ইঞ্চি জায়গা দখল করছে? ১৯৭১ ইং সনে এরা তো ধুতি মাথায় উঠিয়ে বাংলাদেশ ছেড়ে ভারত পালিয়েছিল!

তাহলে তারা বীর হয় কীভাবে?

হ্যা, রামায়ন-মহাভারতে তাদের অর্জুন-কর্জুন নামে কিছু বীর আছেন। যাদের নাম শুধু পৃষ্ঠাকে কালো করেছে, এদের না আছে বাস্তবতা, না আছে ভিত্তি!

এবার আসুন, সাম্প্রতিক হিন্দু রাজ্য ভারতের কিছু বীরত্ব জানার চেষ্টা করি!

● পাকিস্তানের সাথে তাদের বেশ কয়েকবার যুদ্ধ হয়েছে, কারগিলের যুদ্ধ, '৬৫ টির যুদ্ধ ইত্যাদি। প্রায় প্রতিবারই তারা পাকিস্তানের হাতে রামধোলাই খেয়েছে।

● ষাটের দশকে চীনের সাথে তাদের লড়াই হয়, তখনো চীনাবাদাম খেয়েছে। এখনো ভারতের এমন কিছু এলাকা আছে, যেখানে চীনা সেনারা তাদের সাথে বাংলাদেশকে নিয়ে বিএসএফের যেমন আচরণ তেমন আচরণ করে।

● আর বাংলাদেশের বিডিআরের সাথে তো ২০০১ সালে সীমান্তে যুদ্ধ হয়। সেখানে ৫ বিডিআরের মোকাবেলায় ১৫০ বিএসএফ কুপোকাত হয়।

● কাশ্মীরের জনসংখ্যা মাত্র ১ কোটি। যার মধ্যে হিন্দু প্রায় ২৫%। আর মুজাহিদ মাত্র ৩ থেকে ৫ হাজার! এই ৫ হাজার মুজাহিদের মোকাবেলায় তাদের সৈন্য ৮ লক্ষ!!!!! যা কখনো পাক সীমান্তের গোলযোগের সময় ১০ লক্ষে পৌছে যায়!!!

অর্থাৎ ১ জন মুজাহিদের মোকাবেলায় ১৬০ রামসেনা!!!

দেখলেন, তাদের বীরত্ব!!! আর এই বীরত্বের বলেই তারা 'হিন্দুস্তান'কে 'রেপীস্তানে' পরিণত করেছে।

তারা তো সোমনাথ মন্দিরের সেই কামোন্মাদ ব্রাহ্মণ সেবকদের উত্তরসূরি যারা তাদের দেবতার সন্তুষ্টির জন্য সর্বদা পাঁচশ' নর্তকী এবং দুশ' গায়িকার নৃত্য-গীতির আয়োজন করত, কুমারী মেয়েদের ধর্ষণ করত ও বলি দিত।

এদের শায়েস্তা করতে ছুটে এসেছিলেন সুলতান মাহমুদ গজনবী, যিনি এই রামসেনাগুলোর নিকট এক অপ্রতিরোধ্য শক্তি হিসেবে আবির্ভুত হয়েছিলেন। এদের উত্তরসূরি বীরেরা (!) আবারো পুরো ভারতবর্ষকে সেই সোমনাথে পরিণত করেছে, এবং সুলতান মাহমুদের সন্তানদের প্রলুব্ধ করছে আরেকটি 'ভারত অভিযানে'র জন্য ও প্রকৃত বীরত্ব কি তা বুঝিয়ে দিবার জন্য।

এজন্যে কাশ্মীরী মুজাহিদরা এক নাশীদে বলেছিলেন,

'হিন্দু লশকর দুনিয়া ভরকে সবসে বড়া বুযদিল হ্যায়!'

এখন হয়তো বলবেন, তাহলে তারা সিকিম, জুনাগড়, বরোদা এবং হায়দ্রাবাদ কীভাবে দখল করলো?

আসলে এগুলো সিংহের বীরত্বে নয়, বরং শৃগালের চাতুর্যে দখল করেছে।

আর এই হিন্দুদের বর্তমান শক্তিশালী রাজ্য হচ্ছে ভারত। আমরা নাকি এই ভারতকে খুউব-ই ভয় পাই!!!

আমরা ভারতকে বলে দিতে চাই,, যে ক্ষমতার বলে তাদের লক্ষনসেন বখতিয়ারের ভয়ে পালিয়ে ছিল, আমরা সেই বখতিয়ারের বলে বলীয়ান!

যে লক্ষ্য নিয়ে বিন কাসিম সিন্ধুতে আগমন করেছেন, আমাদেরও সেই লক্ষ্য!

যে গগনবিদারী ধ্বনি দিয়ে আহমদ শাহ আবদালি পানিপথের ময়দান প্রকম্পিত করেছেন, ইনশাআল্লাহ আমরাও সেই ধ্বনি সহকারে তাদের সামনে আবির্ভুত হবো!

অতএব তোদের শাহজালাল আর খান জাহানের মাটিকে নিয়ে স্বপ্ন দেখা, আর পঙ্গপালের আগুনে ঝাঁপ দেওয়া একই কথা!

তারপরও যদি হাত বাড়াও, তাহলে রাশিয়ার (সোভিয়েত ইউনিয়নের) পরিণতির কথা স্মরণ করে নাও!

সবশেষে সত্যিকারের বীরদের উদ্দেশ্যে মাওলানা আসিম উমার (হাফিযাহুল্লাহ)'র কিছু কথা,

সময় এসেছে সেই ধাতুনিঃস্রব জিহাদের অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলণের যা আপনারা নিজেদের অন্তরে দমিত করে রেখেছেন, সেই ১৮৭৫ সাল থেকে। এখন সময় দেবত্বের দাবীদারদের দেখানোর, যে আপনাদের শিরায় উপশিরায় এখনও মুহাম্মাদ বিন কাসিমের রক্ত দৌড়ে। এটা সময় তাদের দেখানোর, যে, মুসলিম মায়েরা গাওরী ও গাযনাবী'র কাহিনী এখনও তাদের সন্তানদের কাছে বর্ণনা করেন। এটা সময় তাদের দেখানোর আওরঙ্গজেবের লোক কাহিনী এখনও ভারতীয় মুসলিমদের বিবেক জাগ্রত করে এবং মহিশূরের সিংহের বিখ্যাত মন্তব্য এখনও ভারতীয় মুসলিম যুবকদের প্রণোদিত করে মৃত্যুর জন্য একটি সম্মানিত মৃত্যু।

হে মুহাম্মাদ বিন কাসিমের সন্তানরা! হে আওরঙ্গজেব ও গাযনাবীর উত্তরসূরীরা! উঠে দাঁড়ান ও জিহাদের ময়দানের দিকে অগ্রসর হোন একজন বোনের পর্দা কেড়ে নেয়ার আগে... মুসলিমদের আবারও একত্রে জীবন্ত দগ্ধকরণের আগে। আবারও খিলাফাহ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাকরণে জিহাদের রঙ্গভূমির দিকে অগ্রসর হোন! সার্বজনীন জিহাদের বাহিনীতে যোগ দিন! আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আপনাদের সাহায্য করবেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আপনাদের সাহস যোগাবেন! আপনারা যদি এই পথ বেছে নেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আপনাদের কারণে এই জাতিকে সম্মানিত করবেন।

আর সকল প্রশংসা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার। যিনি বলেছেন,

﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾

"(আসলে) আল্লাহ তা'আলা যদি (যুগে যুগে) একদল লোককে দিয়ে আরেকদল লোককে শায়েস্তা না করতেন, তাহলে এই ভূখন্ড ফিতনা ফাসাদে ভরে যেতো, (কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তা চাননি, কেননা) আল্লাহ তা'আলা এ সৃষ্টিকুলের প্রতি বড়োই অনুগ্রহশীল!"(সুরা বাকারা, আয়াত ২৫১)



হিন্দুস্তানের মুসলমানদের প্রতি একটি আহ্বান

-মাওলানা আসেম ওমর হাফিযাহুল্লাহ

আজ দিল্লীর মাটি থেকে কি কোনো শাহ ওয়ালীউল্লাহ জন্ম নিতে পারে না, যিনি মুসলামানদেরকে খিলাফতের ভুলে যাওয়া সবক স্মরণ করিয়ে দিয়ে জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করবেন। দিল্লীর মাটি থেকে ওঠে বালাকোটের এবড়ো থেবড়ো ময়দানের রক্ত-কাঁদায় লুটোপুটি খাওয়া মুজাহিদ দলটির কোন ওয়ারিশ কি অবশিষ্ট নেই- যারা কুফুরী জীবনব্যবস্থার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নিজেদের জীবনকে আল্লাহর রাস্তায় উৎসর্গ করার বাসনা পোষণ করবে?

ইউ.পিতে কোন মা কি এমন নেই, যিনি নিজের বাচ্চাদেরকে এমন সঙ্গীত শুনাবেন, যা শুনে সন্তানরা বাজার, পার্ক এবং খেলার মাঠে যাওয়ার পরিবর্তে শামেলীর ময়দান প্রস্তুত করবে? (যে প্রান্তরে উলামায়ে হক্ব ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছিলেন)

বিহারের মাটি কি এতোটাই অনুর্বর হয়ে গেলো যে, আজিমাবাদের মুজাহিদীনদের মতো একটা জামাত তৈরী করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে? বাংলার যমীনের ওপর কোন কাফেরের বদনজর লাগলো যে, বহুকাল হয়ে গেলো সিরাজুদ্দৌলাদের দেখার আশায়; স্বপ্নদ্রষ্টা সেই দল আজ কোথায়?

এদিকে ভারতের দক্ষিণ প্রদেশের মুসলমানরা কি মহিসূরের সিংহের (সুলতান টিপু) ঐ কথাগুলো ভুলে গেছে, যা শুনে আজও কাফেররা কেঁপে ওঠে?!

গুজরাটের মাটি- যেখানে সর্বপ্রথম মুসলমানদের পা পড়েছে, যেখানে কুফুর শিরকের শ্লোগানের বিরুদ্ধে তাকবীর ধ্বনি সর্বপ্রথম বেজে ওঠেছিলো তার কী হল যে, তার স্লোগানে আজ তাকবীর ধ্বনিত হচ্ছে কিন্তু তাতে সেই প্রাণশক্তি নেই যাতে সোমনাথের মন্দিরে কম্পন সৃষ্টি করতে পারে!

এগুলো তো এমন প্রশ্ন যা ইতিহাসের সাধারণ একজন ছাত্রও করার অধিকার রাখে। আজ যেহেতু পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে জিহাদের ধ্বনি উচ্চারিত হচ্ছে এবং প্রত্যেক দেশের মানুষ আফগানিস্তানের যুদ্ধে শরীক হওয়ার পর নিজ নিজ দেশে আল্লাহর দীনকে বুলন্দ করার আওয়াজ তুলছে; এমন সময় বিশ্বযুদ্ধের সেনানায়ক হিন্দুস্তানের উলামায়ে কেরামের কাছে এটা জিজ্ঞাসা করার অধিকার অবশ্যই রয়েছে যে, হিন্দুস্তানের মুসলমানগণ যারা যুগে যুগে দীনের ঝান্ডা উঁচু করেছিলো, উলামায়ে হিন্দ ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত নাজুক পারিস্থিতিতেও, শত কষ্ট সহ্য করেও যারা জিহাদ ছাড়েননি, আজ তাদের কী হলো যে, জিহাদের ময়দান হিন্দুস্তানের মুজাহিদশূন্য দেখা যাচ্ছে। অথচ হিন্দুস্তানের জিহাদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশেষ ফযিলত বর্ণনা করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

عصابتان من أمتي أحرزهما الله من النار عصابة تغزوا الهند وعصابة تكون مع عيسى ابن مريم عليهما السلام.

অর্থ: "আমার উম্মতের দু'টি দলকে আল্লাহ তা'য়ালা জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন। এক দল হলো তারা, যাঁরা হিন্দুস্তানের জিহাদে অংশগ্রহণ করবে। আর দ্বিতীয় দল হচ্ছে তারা, যাঁরা হযরত ঈসা ইবনে মারয়াম আ. এর সাথে থাকবে। (তাঁর সাথে থেকে যুদ্ধ করবে)।" (নাসায়ী শরীফ, খন্ড ১০, কিতাবুল জিহাদ, গাযওয়াতুল হিন্দের যুদ্ধ পরিচ্ছেদ) অন্য হাদীসে রয়েছে,

وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الهند فإن أدركتها أنفق فيها نفسي ومالي فإن أقتل كنت من أفضل الشهداء وان أرجع فأنا أبو هريرة المحرر.

একটু স্মরণ করে দেখ! হিন্দুরা কত উল্লাস করেছিলো সে সময়। মনে হয়েছে তারা হাজার বছরের দাসত্বের বদলা নিয়েছে। না, কখনো না; সেদিনকে তোমরা ইচ্ছা করলেও ভুলতে পারবে না। নিজেকে ধোঁকা দিও না। সেই উত্তেজনাকর মুহূর্তগুলো স্মরণ করো, যখন তোমরা ভারতীয় পুলিশের গুলির সামনে বুকটান করে অগ্রসর হচ্ছিলে! সেই স্পৃহা, সেই উত্তেজনা, সেই আগুন, সেই স্রোত- যা তোমাদের অন্তরকে আলোড়িত করেছিল তা আবারও উজ্জীবিত করার সময় এসে গেছে। এখন তাতে শুধু জিহাদের একটু স্ফুলিঙ্গের প্রয়োজন।

হ্যাঁ, আজ সারা বিশ্বের মুসলমানরা কুফুরী জীবনব্যবস্থার বিরুদ্ধে জেগে উঠেছে। আফগানিস্তানকে দেখো! তালেবানরা একমাত্র আল্লাহর সাহায্যে জগতের খোদা দাবীদার সেই আমেরিকা ও তার টেকনোলজীর, প্রযুক্তির দম বের করে ছেড়েছে।

বিশ্বের মুসলিমরা ঐ পবিত্র ভূমিতে জিহাদ শিখেছে, আর নিজ নিজ দেশে গিয়ে আল্লাহর আইনকে বুলন্দ করার জন্য জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এখন জিহাদের ময়দান হিন্দুস্তানের মুজাহিদের প্রতীক্ষায়! হিন্দুস্তানের নওজোয়ানদের প্রতীক্ষায়! আওরঙ্গজেব ও টিপু সুলতানের উত্তরসূরীদের প্রতীক্ষায়!

ঐ কাপুরুষদের কথায় কান দিবে না, যারা তোমাদের ইন্ডিয়ান শক্তির ভয় দেখায়। যদি জিহাদের শক্তি আমেরিকার দম্ভ ধুলোয় মিশিয়ে দিতে পারে, তাহলে হিন্দু কাপুরুষরা তোমাদের মোকাবেলায় কতদিন আর টিকতে পারবে? তোমাদের বাহু তো বহুবারের পরীক্ষিত।

তারা তো শুধু নিরস্ত্র, দুর্বল, শিশু-নারী ও বৃদ্ধ মুসলমানদেরকেই মারতে পারে। তালেবান ও মুজাহিদীনে ইসলামের মুকাবেলা করার হিম্মত তাদের মায়েরা তাদের শেখায়নি। হিন্দুরা একটা ধোঁকাবাজ শত্রু, যারা তোমাদের প্রতারণার শ্লোগান শুনিয়ে গোলাম বানিয়ে রেখেছে। এরা ময়দানে তোমাদের মোকাবেলা করতে পারবে না। সুতরাং এখনই সময় জেগে ওঠার; পরাধীনতার শেকল ছিন্ন করার।

হিন্দুদের দাসত্ব থেকে বের হওয়ার জন্য সম্মানের পথ ধরো। দিল্লী হিন্দুদের নয়; তোমাদের! তার ওপর ব্রাহ্মণদের ছাতি নয়; মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঝান্ডা সমুন্নত হবে।

আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়ন হওয়ার সময় ঘনিয়ে এসেছে- 'তোমরা হিন্দুস্তানের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে। হিন্দু নেতাদের শিকলে বেঁধে নিয়ে আসবে।'

তোমাদের বুযুর্গ নিয়ামতুল্লাহ রহ.ও ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন সীমান্ত প্রদেশ ও কাবায়েলী লোকেরা বাঘের ন্যায় গর্জে উঠবে এবং দিল্লী, দক্ষিণাত্য, পাঞ্জাব ও পুরো ভারত বিজয় করবে। এখন তো সীমান্তবর্তী উপজাতীয় এলাকায়ও মুজাহিদ বাহিনী তৈরী হচ্ছে। যারা এতদাঞ্চলে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শরীয়ত বাস্তবায়ন করবে ইনশাআল্লাহ।

হে হিন্দুস্তানী নওজোয়ানেরা!

যে কথা তোমার আমার সর্দার মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলে গেছেন, তা ধ্রুব সত্যই হয়ে থাকবে। হিন্দুদের সম্মিলিত শক্তি এবং ভারতের টেকনোলজী আমার নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা ভুল প্রমাণ করতে পারবে না। হিন্দুস্তানে আবারও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঝান্ডা পতপত করে উড়বে। মুজাহিদরা একে বিজয় করবে। এখানে আবারও মুসলমানদের রাজত্ব চলবে। সুতরাং উক্ত ফযিলত অর্জন করার জন্য, উক্ত জিহাদে শরীক হওয়ার জন্য বের হয়ে পড়। জিহাদের প্রস্তুতি নাও। জিহাদ ফরযে আইন হলে জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণও ফরযে আইন হয়ে যায়। (শুধু জিহাদ ফরযে আইন হলে নয়; বরং সর্বাবস্থায় জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করা ফরযে আইন। ফরযে আইনের সুরতে তো অবশ্যই - অনুবাদক)

হিন্দুস্তানে তো আজ নয়; বরং সেদিনই জিহাদ ফরজ হয়েছিল, যেদিন ইংরেজরা হিন্দুস্তান দখল করে নিয়েছিল। এরপর হিন্দুদের হাতে মুসলমানদের প্রবাহিত রক্ত দরিয়া এ বিধানকে জোড়ালো করেছে। তারপরও যদি কারও সন্দেহ থেকে থাকে, তাহলে বাবরী মসজিদের শাহাদাত সব সংশয় সন্দেহের অবসান ঘটিয়ে দিয়েছে। আমাদেরকে গণহারে হত্যা করা বা জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ করা, আমাদের ধন-সম্পদ লুট করা বা আমাদের বোন, কন্যাদের সম্ভ্রম হানি করা, এটা শুধু আবেগপ্রবণ হিন্দুদেরই কাজ নয়; বরং এর সাথে পুরোপুরি জড়িয়ে আছে ভারতের সরকারী শক্তি তথা ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি, ব্যুরোক্রেসি, পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর সবাই। আমাদের ক্ষতে মলম লাগানোর বাহানায় কখনো কংগ্রেস ময়দানে উপস্থিত হয়, কখনো বা অন্য কোন পার্টি রাজনৈতিক ফায়দা লুটার চেষ্টা করে। তবে মনে রাখা চাই الكفر ملة واحدة 'সব কাফের এক দল।' তাই এরা শুধু ধোঁকা দেয়ার জন্যই মাগুর মাছের মতো মায়াকান্না দেখায়, বাস্তবে এরা সবাই আমাদেরকে ধ্বংস করার জন্য, আমাদের আগত প্রজন্মকে হিন্দু বানানোর জন্য একই পথের পথিক, এক ও ঐক্যবদ্ধ।

আপনারা ভালো করেই জানেন, হিন্দুরা সেই কুলাঙ্গার জাতি, যারা শুধু শক্তির গোলাম। দুর্বল মুসলমানদের সাথে সহনশীল আচরণ করা এদের চরিত্রে নেই। প্রহারিতকে প্রহার করা, পড়ে যাওয়া ব্যক্তির গলায় পা দেয়া, থেতলে যাওয়া মানুষেকে আরো থেতলে দেয়াই তাদের স্বভাব। এতে তারা বিকৃত আনন্দ লাভ করে, তৃপ্তির ঢেকুর তোলে।

আপনারা ভারতের আদি বাসিন্দাদের (বর্তমানে যারা চরমভাবে দলিত) দেখেননি? প্রথমে হিন্দুরা এদের ওপর অত্যাচারের পাহাড় চাপিয়েছে। কোটি কোটি লোককে হত্যা করেছে, অবশিষ্টদের জোরপূর্বক হিন্দু বানিয়েছে, তাদের বংশ নির্বংশ করার জন্য, তাদের ইতিহাস বিকৃত করেছে। অবশেষে তাদেরকে রাখাল ও চামার বানিয়ে নিকৃষ্ট জাতিতে পরিণত করেছে।

যখন এরা নিজেদের এই পরিণতি অজান্তেই গ্রহণ করে নিলো, আর হিন্দু ব্রাহ্মণরা বোঝে নিলো যে, তারা আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে, তখন তাদের জন্য চাকুরীর গুটিকতেক কোটা খালি করে দিলো। ব্রাহ্মণদের এমন আচরণ তো কেবল তাদের সাথেই ছিলো, যারা ব্রাহ্মণদের ধর্মও গ্রহণ করে নিয়েছে। তাহলে তুমি যখন মুসলিম তখন তোমার সাথে তাদের শত্রুতা কোন পর্যায়ের হবে তা সহজেই বোঝে আসে। কেননা এরা মুসলমানদের আদি শত্রু, আমাদের ও তাদের মধ্যে ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ব রয়েছে।

আমার ভাইয়েরা!

রাষ্ট্র ক্ষমতা, প্রশাসন সব তাদের হাতে তাই বিভ্রান্ত হবেন না। দেশের সংবিধান তারাই রচনা করে, শিক্ষানীতিতেও তাদের একচ্ছত্র অধিকার, আপনাদের তারা কিভাবে অগ্রসর হতে দিবে?

আপনি কি মুসলমান থাকা অবস্থায় রাষ্ট্রের কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে পারবেন?

আপনি কি সেনাবাহিনীর উচ্চপদে উন্নীত হতে পারবেন? এতে আপনাকে তারা ধোঁকা দিবে, তারা কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদে নামে মুসলমান আসলে কাফের ও ধোঁকাবাজদের সামনে এনে রাখে, যাতে মুসলমানদের হৈ চৈ না সওঠে। যাতে মুসলিমরা শান্ত থাকে। অথচ তারা যাদেরকে সামনে রাখে, মডেল হিসাবে ডিসপ্লেতে দেখায়, তারা তো হিন্দুদের চেয়েও নিকৃষ্ট।

যারা মুসলমানের নামে নাম রেখে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে দুশমনী করে, আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বেয়াদবীমূলক আচরণ করে; যাদের ঘরের মধ্যে মন্দির! তারা কিভাবে মুসলমান হতে পারে?

অতএব ব্রাহ্মণদের গোলামী থেকে মুক্তি পেতে, ভারতের অত্যাচার হতে নিষ্কৃতি পেতে এবং নিজেদের হারানো সম্মান ফিরে পেতে হলে আমাদের সে পথেই অগ্রসর হতে হবে, যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বাতলে দিয়েছেন। এ উম্মতের লাঞ্ছনা ততক্ষণ পর্যন্ত চেপে থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত এই উম্মত জিহাদের পথে ফিরে না আসবে।

ঐ দেখো! মুসলিম বিশ্বের প্রতিটি খিত্তা এবং প্রতি ইঞ্চি মাটি তোমাকে জিহাদের আহ্বান করছে। উম্মতে মুসলিমার ভাগ্যাকাশে নতুন এক প্রভাত উদিত হয়েছে। আপন শরীরে বিস্ফোরক বেঁধে কাফিরদের ভীড়ের মধ্যে ঢুকে জীবন বিলিয়ে দেয়া উম্মাহর আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন বোনেরা তোমাদেরকে আত্মমর্যাদা শিখতে উদ্ধুদ্ধ করে বলছে যে, হে হিন্দুস্তানী ভাইগণ! জিহাদে আল্লাহ তাআলা সেই শক্তি রেখেছেন, কাফেরদের বিয়াল্লিশটি দেশ মিলেও যার মোকাবেলা করতে পারছে না।

খোদার দাবীদার আমেরিকা নিজেদের আধুনিক ড্রোন ও স্যাটেলাইটের বাহক হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের হেড কোয়ার্টার পেন্টাগন ও কাবুলে অবস্থিত বেসক্যাম্প বাগরামকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না। শুধু কয়েকজন অত্মোৎসর্গকারী যুবকই আল্লাহর সাহায্যে তা ধ্বংস করে দিতে পারে।

শাম ও ইয়ামানের দিকে একটু দেখো!

দজলা-ফোরাতের দেশ ইরাকের পুণ্যভূমি থেকে ভেসে আসা জিহাদী তারানার সূর-লহরী কান পেতে শোনো!

আফগানিস্তানের পাহাড়ের চূড়া থেকে তাকবীর ধ্বনি উচ্চকিতকারী তোমাদের মুজাহিদ ভাইগণ অস্ত্রসজ্জিত অবস্থায় জান হাতে নিয়ে জান্নাতের বিনিময়ে আপন জীবনের সওদা করেছে। এদের মাঝে অল্প বয়সের ছেলেরাও আছে, আছে তাগড়া যুবক, তোমাদের মা-বোন ও সফেদ চুল-দাড়ির এই উম্মাহর বয়োজ্যেষ্ঠরাও। এরা সবাই রয়েছে তোমাদের অপেক্ষায়। এরা সবাই হিন্দুস্তানের মুসলমানদের সাথে রয়েছে। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রভুর শপথ! ফিলিপাইন থেকে মরক্কো পর্যন্ত মুজাহিদীনরা তোমাদের সাথেই থাকবে। মক্কা, মদীনার

শাহজাদা, শাম, ফিলিস্তিন, মিশর, লিবিয়া, আল-জাযায়ের, মরোক্কোর মুজাহিদীনরা একত্র হয়ে সেখানে উপস্থিত হবে, যেখানে সর্বদা ইসলামের পতাকা উড্ডীন হতো। খোরাসান, শাম, আফগানিস্তান শুধু তোমাদের আহ্বানের অপেক্ষায়। এরপর দেখতে পাবে, যেখানে তোমাদের চোখের পানি পড়বে, সেখানে তারা রক্ত প্রবাহিত করবে। তোমাদের প্রতি প্রসারিত কালো হাতগুলো তারা কেটে টুকরো টুকরো করে দিবে। যে হাতগুলো তোমাদের শিশু ও নারীদের জীবিত জ্বালিয়েছে। বদর ও হুনাইনের রবের কসম! মুজাহিদগণ সেই নাপাক হিন্দুদের আবাসভূমি, পানিপথের রণাঙ্গন বানিয়ে দিবে।

নিজেরা একবার সেই ভাইদের আহ্বান করে দেখো না! তারা তো নিজেদের জীবন বিক্রি করে দিয়েছে এ জন্যই যেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত সম্মান, আত্মমর্যাদা ফিরে পায়। কাফেরদের গোলামী থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহর গোলাম হয়ে যায়। কুফফারদের জীবনব্যবস্থা প্রত্যাখ্যান করে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত সত্য, সুন্দর জীবনব্যবস্থা সাদরে গ্রহণ করে শান্তিতে জীবন যাপন করতে পারে।

আর বিলম্ব নয়। আর একজন মুসলিম বোনের ওড়নায় পুনরায় হাত পড়ার পূর্বেই, মুসলমানদের একত্র করে তাদের ওপর তৈল ঢেলে জীবিত জ্বালানোর পূর্বেই!

হে মুহাম্মাদ বিন কাসিম ও সুলতান মাহমুদ গজনবীর উত্তরসূরীরা! আওরঙ্গজেব ও আহমাদ শাহ আবদালীর বংশধরেরা! তোমরা জেগে ওঠো! তোমাদের লাঞ্ছনার কাহিনী তো অনেক রচিত হয়েছে, এখন তোমরা আল্লাহর রাসূলের দুশমনদের আবাসগুলোকে পানিপথে পরিণত করো। বর্তমান পরিস্থিতির চাহিদা হলো আরও একটি পানিপথ রচিত হোক, আর অপেক্ষা কিসের?

আল্লাহর অনেক ঘরকে ভূলুণ্ঠিত করা হয়েছে। এখন জিহাদের সময়, জেগে ওঠার সময়, জেগে ওঠো এবং মূর্তিপূর্ণ মন্দিরগুলোকে (গজনবীর) সোমনাথ বানিয়ে দাও। ইব্রাহীম আ. এর প্রিয় সুন্নাত পুনরুজ্জীবিত করো, হাতিয়ার নাও আর ব্রাহ্মণদের সামনে ঘোষণা দাও-

বলো সবাই বিজয় ধ্বনি,
প্রভুর মদদ সঙ্গে জানি,
জ্বলবে আগুন ভারতজুড়ে,
শিখা ঝরে আমার তোপের।
তাওহীদীরা আসছে এবার
পৌত্তলিকদের সময় মরার
কসম খোদার রব শুহাদার
জ্বলবে ভারত নরক আঁধার।

প্রখ্যাত মুজাহিদ আলেম আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ. এর কবিতা

তিনি বলেন,

كَيْفَ الْقَرَارُ وَكَيْفَ يَهْدأُ مُسْلِمٌ * وَالْمُسْلِمَاتُ مَعَ الْعَدُوِّ الْمُعْتَدِيْ

"কিভাবে একজন মুসলিম স্থিরচিত্তে বসে থাকতে পারে, যখন মুসলিম রমণীগণ শত্রু পরিবেষ্টিত।"

اَلضَّارِبَاتُ خُدُوْدَهُنَّ بِرَنَّةٍ * اَلدَّاعِيَاتُ نَبِيَّهُنَّ مُحَمَّد

"যারা তাদের গাল চাপড়িয়ে কাঁদে, এবং তাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বরণ করে।"

اَلْقَائِلَاتُ إِذَا خَشِيْنَ فَضِيْحَـةً * جُهْدَ الْمَقَالَةِ لَيْتَنَا لَمْ نُوْلَدْ

"যখন তাদের সম্ভ্রম বিনষ্ট হওয়ার আশংকা দেখা দেয়, তখন তারা অস্থির হয়ে বলে, হায়! আমরা যদি ভূমিষ্টই না হতাম।"

مَا تَسْتَطِيْعُ وَمَالَهَا مِنْ حِيْلَةٍ * إِلَّا التَّسَتُّرَ مِنْ أَخِيْهَا بِالْيَدِ

"তারা এতই অসহায় যে, শত্রুর কবল থেকে হাত দিয়ে নিজেকে আড়াল করা ছাড়া তাদের আর কিছুই করার থাকেনা।"

(সিয়ারু 'আলামিন্ নুবালা ৮/৪১৬)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ভবিষ্যদ্বাণী

'মনে রেখো, ইসলামের চাকা ক্রমশ ঘুরছে। সুতরাং তোমরা যেন কোরআনের পথ ভুলে না বস। শোন, কোরআন আর শাসনক্ষমতা অচিরেই বিপরীত মেরুতে অবস্থান করবে। সাবধান, কোরআন ছেড়ে বসোনা যেন ! ভবিষ্যতে এমন শাসক আসবে যারা তোমাদের উপর ছড়ি ঘোরাবে–যদি তাদের বশ্যতা মেনে নাও, তাহলে নির্ঘাত তারা তোমাদের পথহারা করে ছাড়বে। আর যদি তাদের প্রত্যাখ্যান করো, তবে তারা জমদূত হয়ে হাজির হবে। সাহাবী মুআজ রাযি. জিজ্ঞেস করলেন, আমরা কোন্ পথ ধরবো তা যদি বলে দিতেন? রাসূল সা. বললেন, তোমরা বরং ঈসা আ. এর সহচরদের মতো হয়ে যাও, তাঁরা শুলিতে চড়েছে, জীবন বিপন্ন করেছে; কিন্তু সত্যপথ হতে বিচ্যুত হয়নি।

–তবরানী

